অষ্টম কৃষ্ণা স্মারক উদযাপন অনুষ্ঠানে ভাষণ

আশারকথাঃ

স্বাস্থ্য , অতিমারি ও আশাকর্মী

সাবির আহমেদ

কৃষ্ণা মেমোরিয়াল ট্রাস্ট 2021

সাবির আহমেদ

প্রতীচী (ইন্ডিয়া) ট্রাস্ট এর ন্যাশনাল রিসার্চ কোর্ডিনেটর

অষ্টম কৃষ্ণা স্মারক উদ্যাপন অনুষ্ঠানে ভাষণ

আশার কথাঃ

স্বাস্থ্য , অতিমারি ও আশাকর্মী

- সাবির আহমেদ

গোড়ার কথা

করোনা অতিমারি রুখতে গত বছরের(২০২০) মার্চ মাসে ভারতবর্ষে পৃথিবীর কঠিনতম লকডাউন ঘোষণা করা হয়। সেই দীর্ঘকালীন লকডাউনের ফলে সামজিক, অর্থনৈতিক দিক থেকে জনজীবনের স্বাভাবিক ছন্দ যখন বিঘ্নিত, মারণ রোগের হাত থেকে বাঁচতে আমরা যখন গৃহবন্দি, তখন আমাদের জীবন বাঁচাতে, মারণ ভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে ভারতবর্ষে প্রায় দশ লক্ষ 'আশা'(Accredited Social Health Activists)-কর্মী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গ্রামীণ ভারতবর্ষের প্রতিটা বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিলেন। ১

২০০৫ সাল থেকে জনস্বাস্থ্য, বিশেষ করে মা ও শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার সত্বেও এই আশাকর্মীরা সাধারণ নাগরিক, সংবাদ মাধ্যম ও সর্বোপরি নীতি নির্ধারকদের অগোচরে থেকে গেছেন। অথচ গত পনের বছরে ন্যূনতম সাম্মনিকে আশাকর্মীদের নিরলস পরিশ্রমে জন্মনিয়ন্ত্রণ, শিশুর টিকাকরণ, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সহ একগুচ্ছ জনস্বাস্থ্যের কাজে অভূতপুর্ব উন্নতি হয়েছে। তবে একথা স্বীকার

করতেই হবে এই অতিমারির কারণেই তাঁদের বঞ্চনার ও রাষ্ট্রের অবহেলার কথা সামনে উঠে এসেছে। অতিমারি মোকাবিলার কালে কয়েক মাসের জন্য পারিশ্রমিকের সামান্য বৃদ্ধি হলেও কাজের পরিধি প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। খবরে প্রকাশ, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ভাইরাসের মোকাবিলার ন্যূনতম সুরক্ষা কবচ ছাড়াই একেবারে সামনের সারিতে থেকে আশাকর্মীরা করোনা বিরুদ্ধে লড়াই করেছে।

২ ২০২০ অগাস্ট মাসেই কাজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও সুরক্ষার দাবিতে বিভিন্ন রাজ্যের আশাকর্মীরা সংগঠিত ভাবে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। পশ্চিমবঙ্গের মতো কিছু রাজ্য ছাড়া প্রাথমিক ভাবে তাঁদের দাবি দাওয়া খুব বেশি মান্যতা পায়নি, তবে তাঁদের এই প্রতিবাদ প্রথম বারের মতো উচ্চ পর্যায়ের নীতি নির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। অনেকেই প্রথমবার এঁদের শ্রমের মর্যাদা ও সম্মানের দাবি সমর্থন করেছেন। একটা প্রশ্ন অবধারিত ভাবে উঠে আসে - এতো বড় একটা শ্রমশক্তি জনস্বাস্থ্যের চালক হিসাবে কাজ করলেও কীভাবে

নীতি নির্ধারণের আলোচনা থেকে বাদ পড়ে যায়? তাহলে কি ধরে নিতে হবে মহিলা বলেই এই সামান্য পারিশ্রমিক এবং একরাশ অবজ্ঞা ?

কেন এই গবেষণা

শিক্ষাবিদ কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণে গঠিত 'কৃষ্ণা মেমোরিয়াল ট্রাস্ট'-এর মূল কাজের বিষয় হল – মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মেয়েদের নিয়ে কাজ করছেন এমন মহিলাদের ও সংস্থাকে উৎসাহ দান। ট্রাষ্টের কাজের অন্যতম একটা বিষয় 'কেয়ারওয়র্ক'-এর সঙ্গে যুক্ত মহিলাদের জীবন ও কর্মজগত। কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের শেষ দিকে সেবা ও যত্নের কাজে যুক্ত মহিলাদের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত হন। এটাই হয়তো 'কেয়ারওয়র্ক' উপর কাজের অনুপ্রেরণা। ট্রাষ্টের একেবারে গোড়ার দিক থেকেই এই আগ্রহ দেখা যায়। 'কেয়ারওয়র্ক'-এর সঙ্গে যুক্ত মহিলাদের কাজ সংগঠিত বা অসংগঠিত, যেভাবেই হোক না কেন, রাষ্ট্র ও সামাজ জীবনে এঁদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা খুবই কম। এই নীরবতার ফলে তাঁদের কাজের সঠিক মূল্যায়ন হয় না।

দশ লক্ষের বেশি আশাকর্মী দেশ জুড়ে জনস্বাস্থ্যের কাজে জড়িত, অথচ দেশের একটা বড় অংশের শ্রমশক্তি একেবারে 'অদৃশ্য'! –স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও– বিদ্যাচর্চা, গবেষণা, এমন কী সংবাদমাধ্যমেও প্রায় অনালোচিত। দেশ জুড়ে করোনা মোকাবিলার কাজে এই বিশাল শ্রমশক্তিকে নিযুক্ত করা হল। এই কাজে তাঁদের কী ভূমিকা হবে এ নিয়ে সরকারি ভাবে কাজের তালিকা তৈরি করা হল। অন্যদিকে, এই সময়েই কৃষ্ণা মেমোরিয়াল ট্রাস্টের উৎসাহে পশ্চিমবঙ্গে করোনাকালে আশাকর্মীদের কাজ ও অভিজ্ঞতা নিয়ে গবেষণামূলক কাজ শুরু হয়। এই কাজের অন্যতম উদ্দেশ্য হল 'আশাকর্মী'দের কাজ ও তাঁদের ভূমিকা ঘিরে নীরবতা ভাঙার একটা ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। পশ্চিমবঙ্গে করোনাকালে আশাকর্মীদের কাজ ও অভিজ্ঞতা নিয়ে এই আলোচনা।

এছাড়া আমরা দেখার চেষ্টা করব রুটিন কাজের বাইরে করোনাকালে আশাকর্মীদের কী কী অতিরিক্ত দায়িত্ব বহন করতে হয়েছে এবং এর পাশাপাশি কী ধরণের পেশাগত ঝুঁকি নিতে হয়েছে। তারসঙ্গে 'আশাকর্মী'দের দাবিদাওয়ার একটা

তালিকা তৈরি করাও এই কাজের উদ্দেশ্য।

নিম্নলিখিত ভাবে এই প্রতিবেদন সাজানো হয়েছেঃ

১) কেন এই গবেষণা তাই নিয়ে কিছু কথা।

২) কী ভাবে এই গবেষণার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে অর্থাৎ 'মেথডস' সম্পর্কে দু'চার কথা।

৩) স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে কীভাবে 'আশাকর্মী' দের আবির্ভাব, এর বিস্তার এবং প্রাপ্ত তথ্য ও পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তি করে মা- শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় আশাকর্মীদের অবদান।

৪)গবেষণার ফলাফল –অর্থাৎ, কী দেখলাম।সেখানে প্রথমত, করোনার কাজে আশাকর্মীদের যোগদান নিয়ে সরকারি নির্দেশনামার একটা সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা। এরপর যে আশাকর্মীদের সঙ্গে এই গবেষণার জন্য দীর্ঘ কথোপকথন হয়েছে তাঁদের পরিচয় তথা করোনার আগে আশাকর্মীদের কাজকর্মের ধারা এবং করোনার কালে তাঁদের কাজের প্রকৃতি, অভিজ্ঞতা ও ঝুঁকি সম্পর্কে আলোচনা।

৫) শেষের কিছু কথা ও প্রশ্ন।

মেথড বা কীভাবে এই গবেষণা

করোনা কালে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নীতি ও নির্দেশনামার পর্যালোচনা।

তথ্য অধিকার আইন বলে আবেদন করে নির্দেশারনামাগুলো সংগ্রহ করতে হয়েছে।তথ্য অধিকার আইনবলে তিরিশ দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে তথ্য সরবরাহ করতে হবে এই বিধান থাকা সত্ত্বেও, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে একাধিকবার অনুরোধ করতে হয়েছ এবং অনেক ক্ষেত্রে আংশিক তথ্য পাওয়া গেছে। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অফিসে আধিরিকদের সঙ্গে কথা বলে কিছু তথ্য জোগাড় করা হয়েছে।

সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ পর্যালোচনা।

অতিমারির আগে সংবাদ মাধ্যমে আশা কর্মীদের নিয়ে সংবাদের অপ্রতুলতা কারণে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় নি। অগাস্ট মাসে কয়েকটা রাজ্যে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের ফলে তা সংবাদ মাধ্যমের নজর কাড়ে। এছাড়া করোনা কালে আশাকর্মীদের ভূমিকা নিয়ে বিদেশী সংবাদপত্রে কিছু খবর প্রকাশিত হয়।

আশাকর্মীদের সঙ্গে বিস্তারিত সাক্ষাৎকার।

করোনা মোকাবিলার কৌশলগত কারণে অবাধ যাতায়াতের উপর নানা নিষেধাজ্ঞার সত্ত্বেও কলকাতা পার্শ্ববর্তী তিনটি জেলায় (উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও হাওড়া) ২১ জন আশাকর্মীদের সঙ্গে বিস্তারিত সাক্ষাৎকার নেওয়া সম্ভব হয়েছিল। যদিও এঁদের সরকারিভাবে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে গণ্য করা হয়, অথচ এঁদের সঙ্গে কথা বলতে হলে 'এএনএম'(Auxiliary nurse midwife) দিদি বা পঞ্চায়েতের সঙ্গে কথা না বলে গবেষণার কাজে সাক্ষাৎকার নেওয়া অসম্ভব।

পঞ্চায়েতের কাছ থেকে আশাকর্মীদের সাক্ষাৎকারের অনুমতি নিয়ে তিনটি জেলায় প্রায় ২১ জন আশাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়েছে।

সাক্ষাৎকারের সময় আমরা কয়েকটা বিষয় নিশ্চিত করেছি। ১) আশাকর্মীদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার অনুমতি ২) আমরা তাঁর বক্তব্য অডিও ভিডিও রেকর্ড করছি সে অনুমতি ৩) আশা কর্মীদের নাম সরাসরি কোথাও ব্যাবহার করা হবে না ইত্যাদি। ২১ জন আশাকর্মীর মধ্যে অধিকাংশই তাঁদের বক্তব্য রেকর্ড করার অনুমতি দেন। আশাকর্মীদের সঙ্গে বিস্তারিত সাক্ষাৎকার যাতে খোলামেলা হয় অর্থাৎ তাঁরা মন খুলে

কথা বলতে পারেন আমরা 'এএনএম' দিদি বা পঞ্চায়েত প্রতিনিধির উপস্থিত না থাকতে অনুরোধ করি। আশাকর্মীদের সঙ্গে দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের জন্য আমরা প্রশ্নমালা ব্যবহার করি। এই প্রশ্নমালা মূলত তিনভাগে আলোচনাকে পরিচালনা করতে সাহায্য করে – প্রথমত, আশাকর্মীর পরিচয়, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পারিবারের কথা, এবং কীভাবে এবং কবে এ পেশায় যোগ দিলেন, পরিবারে মেয়েদের কাজ নিয়ে অন্য সদস্যদের মনোভাব ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, অতিমারির আগে আশাকর্মীদের কাজের পরিধি। তৃতীয়ত, অতিমারির সময়ে আশাকর্মীদের কাজের পরিধি, দায়িত্ব ও অভিজ্ঞতা। এই সময় কী কী ধরনের সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়েছিল ? এবং শেষে আশাকর্মীদের অবস্থার উন্নতির জন্য কী কী করনীয় এই নিয়ে আশাকর্মীদের নিজস্ব মতামত।

আশার জন্ম

১৯৪৭ সালে স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বাস্থ্যসূচকগুলো বেহাল অবস্থায় ছিল। সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে ১৯৫০-র দশকে ভারতবর্ষে মা-পিছু জীবিত সন্তানের সংখ্যা

ছিল ছয় বা ছয়ের অধিক। অনিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দেশের উন্নয়ন ও স্বাস্থ্যর পরিকাঠামোর উপর অতিরিক্ত চাপ পড়তে পারে ভেবে ভারত সরকার ১৯৫২ -তে ভারতে জাতীয় জন্মনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী সূচনা করে। বিশ্বে প্রথম এই ধরনের জাতীয় প্রকল্পের সূচনা করা হয়।

১৯৫০ থেকে ১৯৮০র দশক পর্যন্ত নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেও সামগ্রিক স্বাস্থ্য ও জন্মনিয়ন্ত্রণে খুব বেশি সাফল্য দেখা যায়নি। ১৯৮০ -তে জোর দেওয়া হল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) আলমা আটা ঘোষণার বাস্তবায়নের ওপর (Alma Ata 1978: Decleration of Health for All)। দেশের নাগরিকদের সামগ্রিক স্বাস্থ্য উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হল, যদিও বেশির ভাগ কর্মকাণ্ড ছিল শহরকেন্দ্রিক – স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতাল নির্মাণের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। স্বাস্থ্যব্যবস্থার নানা ফাঁকফোকর পর্যালোচনা করে স্বাধীন ভারতে ১৯৮৩-তে প্রথম জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ঘোষণা হয়। এই নীতিও জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উপর জোর দেয়। এর পর ১৯৯৭ সালে - স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক -Reproductive and Child

Health Programme এর সূচনা করে। এর ফলে মা ও শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে সচেতনা বাড়ে ও জন্মনিয়ন্ত্রণের নানা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। এই কর্মসূচির হাত ধরেই ২০০০ সালে 'জাতীয় জন্মনিয়ন্ত্রণ নীতি ২০০০' ঘোষণা হয়। এই নীতির দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্য ছিল জন্মনিয়ন্ত্রণ উপায়গুলোর সহজলভ্যতা, শিশু ও মায়ের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা ও ২০৪৫ এর মধ্যে জনসংখ্যা স্থিতিশীলতা। 'জাতীয় জন্মনিয়ন্ত্রণ নীতি ২০০০' অনুসারে জনসংখ্যা স্থিতিশীলতার লক্ষ্যে ২০০৫ সালে "জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন" প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই কর্মসূচীর অন্যতম অঙ্গ হিসাবে আশা কর্মীদের আবির্ভাব হয়।

"জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন"- এর লক্ষ্যপূরণের জন্য সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও কমিউনিটি-এর মধ্যে সেতু বন্ধনকারী স্বাস্থ্য স্বেচ্ছাসেবেকদের আশাকর্মী হিসাবে গণ্য করা হয়। বলা হয়, আশাকর্মীদের ন্যূনতম - অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা জানতে হবে।

আশাকর্মীদের অন্যতম প্রধান কাজ প্রতিটি গ্রামকে নিকটবর্তী স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সঙ্গে

জুড়ে দেওয়া। এরা মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, সরকারের জন্মনিয়ন্ত্রণ নীতির বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করবেন। কমিউনিটির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে সেই গ্রামের বাসিন্দা হতে হবে। এবং আশাকর্মী কেবলমাত্র গ্রামীন এলাকায় নিয়োগ হয়। শহরের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর্মী থাকলেও, আশাকর্মীদের চেয়ে তাঁদের ভিন্ন ভূমিকা থাকে। ২৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী বিবাহিত / বিধবা ও বিবাহবিচ্ছেদ প্রাপ্ত মহিলাদেরই আশা কর্মী হিসাবে নিয়োগ করা হয়। আশাকর্মীদের মূলত স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে গণ্য করা হয়, এই প্রকল্পের প্রথম থেকেই কোনও নির্ধারিত বেতন নেই। সামান্যমাত্র 'উৎসাহবাচক ভাতা' দিয়ে শুরু হয়। তথ্য অধিকার আইন বলে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকার এই কাজে মাসে ২০০০ হাজার টাকা দেয়, রাজ্য সরকার এর সঙ্গে আরও ভাতা যোগ করে দিতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে করোনাকালেই তা বেড়ে দাঁড়ায় মাসিক ৪৫০০ টাকা, সঙ্গে অন্য নির্ধারিত ভাতা। এক জন আশাকর্মী কাজে যোগদানের পর প্রথম পর্যায়ে আট দিনের প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকেন। বলা হয়, এর কিছুদিন পর তিনি ৬ এবং ৭ মডিউল-এর প্রথম পর্যায়ের

প্রশিক্ষণ শেষ করে গ্রামে কাজে যোগ দেবেন।

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যান মন্ত্রক- এর তথ্য অনুযায়ী, দেশে (গোয়া ছাড়া) সব রাজ্যের গ্রামে ১০ লক্ষ ৪০ হাজার আশাকর্মী জনস্বাস্থ্যের কাজে সামনে সারির স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে কাজ করছেন। **পশ্চিমবঙ্গে** ৫৩৪৮৫ জন আশা কর্মী আছেন। এই রাজ্যের স্বাস্থ্য জেলা অনুসারে আশাকর্মীর তালিকা তথ্য অধিকার আইন বলে প্রাপ্ত হয়েছে।

ক্রমিক সংখ্যা	জেলার নাম	No. of ASHAS of Position (as on 20.11. 2020)	কত জন আশাকর্মী আছেন (২০.১১.২০২০ তথ্য অনুযায়ী)
১	আলিপুরদুয়ার	**994**	৯৯৪
২	বাঁকুড়া	**1935**	১৯৩৫
৩	বসিরহাট এইচ ডি	**1557**	১৫৫৭
৪	বীরভূম	**1667**	১৬৬৭
৫	বিষ্ণুপূর এইচ ডি	**866**	৮৬৬
৬	কোচবিহার	**2227**	২২২৭
৭	দক্ষিন দিনাজপুর	**1435**	১৪৩৫
৮	দার্জিলিং (জি টিএ)	**0**	০
৯	দার্জিলিং (এস এম পি)	**428**	৪২৮
১০	ডায়মন্ডহারবার এইচ ডি	**2391**	২৩৯১
১১	হুগলী	**3131**	৩১৩১
১২	হাওড়া	**2464**	২৪৬৪
১৩	জলপাইগুড়ি	**1357**	১৩৫৭
১৪	ঝাড়গ্রাম	**873**	৮৭৩
১৫	কালিম্পং	**0**	০
১৬	মালদা	**2804**	২৮০৪
১৭	মুর্শিদাবাদ	**5120**	৫১২০
১৮	নদীয়া	**3334**	৩৩৩৪
১৯	নন্দীগ্রাম এইচ ডি	**1502**	১৫০২
২০	উত্তর ২৪ পরগণা	**1856**	১৮৫৬
২১	পশ্চিম বর্ধমান	**490**	৪৯০
২২	পশ্চিম মেদিনীপুর	**3474**	৩৪৭৪
২৩	পূর্ব বর্ধমান	**3385**	৩৩৮৫
২৪	পূর্ব মেদিনীপুর	**2488**	২৪৮৮
২৫	পুরুলিয়া	**1673**	১৬৭৩
২৬	রামপুরহাট এইচ ডি	**1253**	১২৫৩
২৭	দক্ষিন ২৪ পরগণা	**2931**	২৯৩১
২৮	উত্তর দিনাজপুর	**1850**	১৮৫০
	মোট	**53485**	৫৩৪৮৫

সূত্র ঃ তথ্য অধিকার আইন বলে প্রাপ্ত তথ্য, আবেদনকারী সাবির আহমেদ, ২০২১

গত প্রায় বছরখানেক ধরে কর্মীদের নীরবে কাজ করে যাওয়ার কি ফলাফল আমরা পেয়েছি? আলোচনার শুরুতেই ইঙ্গিত করে ছিলাম সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশের নড় বড়ে স্বাস্থ্য কাঠামোর কথা। সেই সময় মোট সন্তান জন্মের হার মা পিছু ছিল ৬ বা তার বেশি জীবিত সন্তান। ২০০5 সালে "জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন" প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই কর্মসূচীর অন্যতম অঙ্গ হিসাবে আশা প্রকল্পের সূচনা হয়। তখনও দেখা যায় মোট সন্তান জন্মের হার মাপিছু (Total Fertility rate) ছিল ২.৮ । বর্তমানে তা দাঁড়িয়েছে ২.২। একাধিক রাজ্যে মোট সন্তান জন্মের হার মা পিছু আরও কম। শিশু স্বাস্থ্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ন সূচক জন্মকালে শিশু মৃত্যুর হার। সরকারি স্বাস্থ্য পরিসংখ্যান অনুসারে, ২০০৬ সালে প্রতি ১০০০ জীবিত শিশুর জন্মের সাপেক্ষে প্রায় ৫৭ জন শিশুর অকালমৃত্যু হত, ২০১৭ সালে এই সংখ্যা কমে দাঁড়ায় মাত্র ৩৩ জন শিশুতে।পশ্চিমবঙ্গে এই সংখ্যা ২২। একই রকম ভাবে, ৫ বছরের নীচে মৃত্যুর হার (প্রতি ১০০০ জীবিত শিশুর জন্মের সাপেক্ষে) লক্ষ্যণীয় ভাবে কমেছে। কমিউনিটির সঙ্গে নিবিড় ভাবে কাজ করার ফলে দেশের প্রায় ১৪ টি রাজ্যে

প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের হার ৯০ শতাংশের বেশি (Children of India 2018)। ২০০5 থেকে এই সংখ্যা প্রায় **দ্বিগুণ** হয়েছে। জননী সুরক্ষা যোজনার সাফল্যের মূল কারিগর আশাকর্মীর দল।

এই 'বেগুনি শাড়ি বাহিনী'র কাজের জন্য মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের নানান বিষয়ে অগ্রগতি হয়েছে এবং মেয়েরা জন্ম নিয়ন্ত্রনও প্রজনন আধিকার নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছেন। তাঁদের কাজের অবদান বর্ণনা করতে গিয়ে এক আশাকর্মী জানালেন, "দেখুন আমরা কাজটা করছি বলেই তো শিশু মৃত্যু হার কমেছে..., মাতৃমৃত্যু এবং শিশুমৃত্যু হার কমেছে আমরা কাজে যোগদান করার পরেই কারণ ঠিক ঠিক সময় যে টীকাকরণ, বিপদের লক্ষন একটা ইনস্টিটিউশনাল ডেলিভারি হলে কি হয়, তাদের কোন কিছু হলে দ্রুত চিকিৎসা পায়ওই যে জিরো ডসে হেপাটাইটিস বি-র টীকা সেটা এক মাত্র ইনস্টিটিউশনাল ডেলিভারি হলেই সেই ফেসিলিটিটা পায়, বাচ্চার কোন কিছু হলে এক বছর পর্যন্ত যেটাই শিশু সুরক্ষা যোজনা বিনামুল্যে চিকিৎসা পায় এগুলো তো পাচ্ছেই, এছাড়া এই টীকাগুলো নেয় বলেই তো তারা রোগগুলো থেকে

রক্ষা পাচ্ছে তাই না”

করোনা কালে সরকারি নীতি ও নির্দেশনামার পর্যালোচনা।

২০২০ সালের প্রথম দিকে করোনা অতিমারি রুখতে বিশ্বের অন্যদেশ গুলির মধ্যে তৎপরতা লক্ষ্য করা গেলেও এ ব্যাপারে ভারতের ঢিলেঢালা মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। অথচ মার্চ মাস নাগাদ করোনা অতিমারির রূপ নিলে ভারত আকস্মিক লকডাউন ঘোষণা করে। এই সময় করোনা মোকাবিলায় আশাকর্মীদের ভূমিকা নিয়ে ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক এর অধীনস্থ ' জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন' এর তরফ থেকে ২৭- এ মার্চ প্রথম নির্দেশনামা জারি করা হয়। এই নির্দেশনামায় এপ্রিল থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত আশাকর্মীদের অতিরিক্ত উৎসাহভাতা প্রদানের কথা বলা হয়েছিল। তবে মনে রাখতে হবে এর জন্য অতিরিক্ত কোন অর্থবরাদ্দ করা হয়নি, বরং আশাকর্মীদের জন্য বরাদ্দ উৎসাহভাতার অব্যবহৃত অর্থ ব্যয় করতে এই নির্দেশ। এই নির্দেশনামা অনুসারে আশাকর্মীদের মাসে ১০০০ টাকার করোনা

মোকাবিলা উৎসাহ ভাতা দেওয়া হবে এবং আশা-সহায়কদের ক্ষেত্রে ৫০০ টাকা দেওয়া হবে। প্রতি গ্রাম পরিদর্শনের জন্য ১০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়। এই নির্দেশনামায় করোনা সংক্রমণ রুখতে আশাকর্মীদের ভূমিকা কী হবে সেটা খুব বিস্তারিত ভাবে বর্ননা করা হয়েছিল। অতিমারি রোধে ভারতবর্ষের প্রায় দশ' লক্ষ আশাকর্মীদের মাঠে নামানো হল। আশাকর্মীদের দিনে প্রায় ২৫ টি পরিবারে ঘরে ঘরে যেতে হবে। এবং পুরো পাড়া পরিদর্শন মাত্র ৮ দিনে করতে হবে। এই পরিদর্শনের সময় আশাকর্মীদের ভূমিকা কী হবে?

১) করোনা নিয়ে পরিবার গুলোতে সচেতনতা বৃদ্ধিকরতে হবে। সেক্ষেত্রে সরকারের তৈরি পুস্তিকা ব্যবহার করতে হবে।

২) করোনা সংক্রমণের কেস দ্রুত চিহ্নিত করা এবং করোনা সংক্রমণের সন্দেহ আছে এমন ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসাকেন্দ্রে রেফার করার ব্যবস্থা,

৩) গত চোদ্দ দিনে ভ্রমণের ইতিহাস আছে, অথবা করোনা সংক্রমণের সন্দেহে আছে এমন ব্যক্তি বা করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছেন এমন ব্যাক্তির তালিকা

প্রস্তুতকরা।

৪) এছাড়া করোনা সংক্রমণের সন্দেহে যাদের নিভৃতবাসের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তাঁদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ / ফলো-আপ রাখা। প্রতি বাড়ি পরিদর্শন কালে করোনা সচেতনা বাড়ানোর সঙ্গে বিশেষ নজর দেবেন - পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যের অবস্থা নিয়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মেডিকাল আধিকারিককে নিয়মিত তথ্য সরবরাহ করবেন, নিভৃত-বাসের পরামর্শ পাওয়া পরিবার বা ব্যক্তি সরকারি নির্দেশ মানছেন কিনা, তা খতিয়ে দেখতে হবে। করোনার প্রাথমিক লক্ষণ দেখে যাঁদের টেস্ট এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তাঁরা ঠিক সময়ে টেস্ট করাচ্ছেন কিনা এই ব্যাপারে মেডিকাল আধিকারিককে দ্রুত জানাতে হবে। পাড়ায় বয়স্ক মানুষ যাঁরা কিছু রোগ ইতিমধ্যে ভোগ করছেন, তাঁদের উপর বিশেষ নজর রাখতে হবে।

এই নির্দেশনামায় বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে নিম্নলিখিত পরিবারের গুলির উপরঃ

- গত পনের দিনে যে পরিবারে ভ্রমণ করে ফিরেছে।
- ৬০ বছরের উর্দ্ধ বয়সি, সঙ্গে নিম্নলিখিত রোগে আক্রান্ত - ডায়বেটীক,

হাইপারটেনশন, হার্টের অসুখ, শ্বাস -প্রশ্বাসের এর সমস্যা।

- করোনা আক্রান্ত ব্যক্তি।
- করোনা সংক্রমণের সন্দেহে আছে এমন ব্যক্তি।
- যে ব্যক্তি নিভৃত বাস থেকে ফিরেছে।
- যে ব্যক্তির উপর গৃহ-নিভৃত বাসে থাকার নির্দেশ আছে।

এপ্রিল মাসে করোনা ভয়াবহ আকার ক্রমশ ধারন করেছিল, লকডাউনের সময়সীমা বাড়নো হয়েছিল, পরিযায়ী শ্রমিকরা প্রাণ হাতে নিয়ে ঘরে ফিরতে শুরু করেছিল। তখন করোনা মোকাবিলায় প্রশাসনের সঙ্গে একদম প্রথম সারিতে আশা কর্মীদের দেখা যায়। গ্রামে মানুষদের সচেতনতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিযায়ী শ্রমিকরা, যাঁরা বাড়িতে ফিরেছেন তাঁদের দেখভালের দায়িত্ব মূলত পড়ে আশাকর্মীদের উপর। এই নিয়ে আশাকর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ জন্মায়, তাঁদেরকে কিছু নিগ্রহের শিকার হতে হয়। (এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা পরে করব।) আশাকর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও দৈহিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ৩ এপ্রিল ২০২০ ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার

কল্যাণ মন্ত্রী একটি নতুন নির্দেশিকা জারি করেছিলেন।

এই নির্দেশিকায় দেখা যাচ্ছে করোনা মোকাবিলার জন্য বহুমুখী কর্মকাণ্ড চালাতে হবে একদিকে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে, নজরদারি / সার্ভেলেন্স বাড়াতে হবে, স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিতে হবে, এবং যাঁরা বাড়িতে নিভৃতবাসে আছেন তাদের উপর নজর দিতে হবে।

এই কাজে আশা কর্মীদের ভূমিকার কথা বেশ জোর দিয়ে বলা হচ্ছে।

মানুষের কাছে পৌঁছতে ও করোনাকে কেন্দ্র করে সচেতনতা মূলক বার্তা বাড়ি বাড়ি পৌঁছতে আশাকর্মীদের ব্যয়ভার বহন করা হবে। এই প্রথম আশাকর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার উপর জোর দিয়ে তাদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ মাস্ক ও স্যানিটায়জারের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। বেশ কিছু রাজ্য এই ব্যপারে উৎসাহ দেখালেও, অনেক রাজ্য এব্যাপারে পিছিয়েছিল। কিছু রাজ্য থেকে আশাকর্মীদের উপর অত্যাচার, দুর্ব্যবহারের খবরও পাওয়া যায়। নির্দেশিকায় আরও বলা হয়, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত, এবং করোনা মোকাবিলায় সবচেয়ে বড় শ্রম-শক্তি আশাকর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে সরকারকে সচেষ্ট হতে হবে। স্বাস্থ্যরক্ষা ও সামাজিক

যত্নপ্রদানের জন্য স্বাস্থ্যব্যবস্থা আশাকর্মীদের উপর প্রভূত নির্ভরশীল। এঁদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য মাস্ক ও স্যানিটায়জারের ব্যবস্থা করতে হবে, এবং আশাকর্মীরা যাতে নির্ভয়ে কাজের এলাকায় ঘুরে বেড়াতে পারেন এই নিয়ে রাজ্যে সরকারকে সচেষ্ট হতে হবে। আশাকর্মীদের নিজের এলাকায় এই কাজে নিযুক্ত করতে হবে, যাতে তাঁরা বিপদের সময় পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের সাহায্য পেতে পারেন। নিরাপদ যাতায়তের জন্য আশাকর্মীদের জন্য 'আইডেন্টিটি কার্ড' দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এই শ্রমশক্তির মধ্য দিয়ে একদিকে করোনা রোগর সংক্রমণ রুখতে, এবং মানুষকে সচেতন হতে হবে।

ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক ২০ এপ্রিল ২০২১ এই নির্দেশনামা জারি করে।

এই নির্দেশনায় করোনা মোকাবিলায় আশাকর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্বীকার করে নেওয়া হয়। করোনা প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং এবং করোনা টেস্টের ব্যবস্থা করা হয়। এই নির্দেশনামায় স্বীকার করা হয়েছে করোনাকালে আশাকর্মীদের তাঁদের নিয়মিত দায়িত্বের বাইরে আরো অনেক কিছু কাজ করতে

হচ্ছে, এবং এর মধ্যে তারা যে ধরনের জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কাজ করতেন তার থেকেও বেশি কাজ করছেন। কোভিড সংক্রান্ত কাজের বাইরেও সাম্প্রতিক নতুন non-profit রিলেটেড এসেন্সিয়াল সার্ভিসের কাজের মধ্যে আশাকর্মীদের বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার, বিশেষ করে যারা আক্রান্ত তাঁদের বাড়ি যাওয়ার অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ।

Sl. No.	উৎসাহভাতা	বর্ণনা	টাকা
১	মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ভাতা	গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবসে তাঁর এলাকার উপভোক্তাদের সমবেত করে নিজেও উপস্থিত থাকবেন।	২০০/-
২	ভিলেজ হেলথ রেজিস্টার সাম্প্রতিকীকরণ	জন্ম ও মৃত্যুর সর্বজনীন নিবন্ধীকরণ, প্রতি বুধবার।	৬০/-
৩	ডিউ লিস্ট	টীকাকরণ বাকি আছে এমন শিশুদের তালিকা তৈরি ও সাম্প্রতিকীকরণ, প্রতি বুধবার।	৬০/-
৪	গর্ভবতী মহিলাদের তালিকা তৈরি ও সাম্প্রতিকীকরণ	প্রতি বুধবার গর্ভবতী মহিলাদের নামের তালিকা প্রস্তুত করা।	৬০/-
৫	সক্ষম দম্পতীদের তালিকা তৈরি ও সাম্প্রতিকীকরণ	প্রতি বুধবার উপস্থিত থেকে সক্ষম দম্পতিদের নামের তালিকা প্রস্তুত করা।	৬০/-
৬	জননীসুরক্ষা যোজনা	গর্ভাবস্থার ১২ সপ্তাহের মধ্যে মহিলার নাম নথিভুক্ত করে এই যোজনায় অন্তর্ভুক্ত করে তার সম্পূর্ণ গর্ভকালীন পরিষেবা ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সফল করা।	১০০/-

Sl. No.	উৎসাহভাতা	বর্ণনা	টাকা
৭	জননী সুরক্ষা যোজনায় থাকা মহিলাদের পরিষেবা সুনিশ্চিত ভাতা	মহিলারা যারা এই যোজনার মধ্যে পড়েন, তাঁদের গর্ভকালীন পরিষেবা (নুন্যতম ৪টি গর্ভকালীন পরীক্ষা, ১৮০টি আয়রন ফলিক অ্যাসিড বড়ি, টিটেনাস ডিপথেরিয়া ইঞ্জেকশান, রক্তপরীক্ষা, মূত্রপরীক্ষা) সেটা সুনিশ্চিত করতে হবে এবং নির্দিষ্ট এলাকা বাইরে থেকে আসা কোন মহিলাকে এই পরিষেবা আশাকর্মীরা দিতে পারলে এই ভাতা তারা পাবেন	২০০/-
৮	জননী সুরক্ষা যোজনার মধ্যে থাকা গর্ভবতী মহিলাদের প্রাতিষ্ঠানিক সরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা ' আয়ুষ্মতী' প্রকল্পের অন্তর্গত প্রসব কেন্দ্রে ভর্তি করার ভাতা	গর্ভবতী মহিলাদের 'আয়ুষ্মতী' প্রকল্পের অন্তর্গত স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বা সরকারী হাসপাতালে ভর্তি করা বা নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে থেকে আসা গর্ভবতী মহিলাকে এই পরিষেবা দিলে আশাকর্মী প্রতি প্রসব পিছু এই ভাতা পেতে পারেন।	৩০০/-
৯	বাড়িতে প্রসবের ক্ষেত্রে বাড়ি ভিজিট ও পরবর্তী পরামর্শ দেওয়ার ভাতা	বাড়িতে প্রসবের ক্ষেত্রে ১ম, ৩য়, ৭তম, ১৪তম দিনে এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের ক্ষেত্রে ৩য়, ৭তম, ১৪ তম দিনে প্রসূতি মা ও নবজাতককে দেখতে যাওয়া। ও	

Sl. No.	উৎসাহভাতা	বর্ণনা	টাকা
		১৪ দিন পর্যন্ত উভয়ে জীবিত থাকলে আশাকর্মী এই ভাতা পাবেন।	১৭৫/-
১০	বাড়িতে প্রসবের ৪২ দিন পর্যন্ত বাড়ি ভিজিট ও পরামর্শ দেওয়ার ভাতা	জন্মের পর ২১ তম, ২৮তম, ৪২তম দিনে প্রসূতি মা ও নবজাতককে দেখতে যাওয়া এবং উভয়ে জীবিত থাকলে আশাকর্মী এই ভাতা পাবেন।	৭৫/
১১	প্রতি ৩ মাস অন্তর নবজাতকদের ১ বছর বয়স অবধি বাড়িতে দেখতে যাওয়া	নিয়মানুযায়ী ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৯ম, ১২তম মাসের শেষে একবার করে নবজাতককে বাড়িতে দেখতে যাওয়া এবং নির্দিষ্ট ফর্ম (ফর্ম ৬) সঠিক ভাবে ভর্তি করে সময়মত মাসিক রিপোর্ট জমা দেওয়ার দিন এন এম কে দিয়ে যাচাই করিয়ে নিলে তবেই শিশু প্রতি ভাতা পাবেন।	৫০/-
১২	টীকা করণের দিন ও গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবসে টীকা নেওয়ার জন্য শিশুদের সমবেত করার ভাতা।	উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে শিশু জন্মের এক বছরের মধ্যে নির্দিষ্ট সময় টীকা ঠিক সময় নিলে, শিশু প্রতি আশাকর্মী ভাতা পাবেন।	১০০/-

Sl. No.	উৎসাহভাতা	বর্ণনা	টাকা
১৩	টীকাকরণ সঠিক সময় দেওয়ার ভাতা	জন্মের ১ বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ টীকাকরণ হওয়া কোন শিশু যদি ১ থেকে ২ বছরের মধ্যে নির্দিষ্ট সমস্ত টীকা ঠিক ঠিক সময় নেয়, তাহলে সে সব ক্ষেত্রে আশাকর্মী শিশুপ্রতি ভাতা পেয়ে থাকেন।	৭৫/-
১৪	ছোট শিশুদের গৃহভিত্তিক যত্নকর্মসূচী (HBYC) ভাতা	৪২ দিনের পর ছোট শিশুদের জন্য আরও ৫ বার যথা ৩ মাস, ৬ মাস,৯ মাস, ১২ মাস, ১৫মাস বাড়ি ভিজিট, নির্দেশিকা অনুযায়ী HBYC কার্ডভর্তি ও MCP কার্ডের প্রযোজ্য করনীয় কাজগুলি লিপিবদ্ধ করা। এবং এখানে উল্লেখ্য যমজ বা তিনটি শিশুর জন্য প্রতি শিশু অনুযায়ী উৎসাহ ভাতা পেয়ে থাকেন।	২৫০/-
১৫	ডিপিটি বুস্টার টীকা দেওয়ার ভাতা	৫ বছর থেকে ৬বছরের মধ্যে ডিপিটি বুস্টার টীকা দেওয়া।	৫০/-
১৬	আয়রন ও ফলিকঅ্যাসিড সিরাপ খাওয়ানোর ভাতা	প্রতিটি যোগ্য শিশুকে (৬ থেকে ৬০ মাস পর্যন্ত) বাড়ি গিয়ে সপ্তাহে ২ দিনে (৮-১০ বার)আয়রন ও ফলিক অ্যাসিড সিরাপের সঠিক মাত্রা খাওয়ানো ও মাসিক রিপোর্ট দেওয়া।	১০০/-

Sl. No.	উৎসাহভাতা	বর্ণনা	টাকা
১৭	গর্ভপাত সংক্রান্ত পরামর্শ দেওয়ার জন্য ভাতা	নিয়ম করে এই পরিষেবা দেওয়া ও ফর্ম ৫ সময় মত মাসিক রিপোর্টের সঙ্গে এন এম কে জমা দেওয়া	১০০/-
১৮	সক্ষম দম্পত্তিদের পরামর্শ দেওয়ার ভাতা	বিয়ের দিন থেকে ২ বছর পর্যন্ত গর্ভধারন বিলম্বিত করার জন্য পরামর্শ দেওয়া	৫০০/-
১৯	পি পি আই ইউ সি ডি গ্রহন করানোর জন্য ভাতা	প্রয়োজন অনুযায়ী প্রসূতি মহিলাকে পিপিআইইউসিডি গ্রহনের জন্য সরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া বা যেতে সাহায্য করা।	১৫০/-

খ] জন স্বাস্থ্য কর্মসূচী সংক্রান্ত -

১	জাতীয় কুষ্ঠ নিবারণ কর্মসূচী (NLEP)	চাক্ষুষ অঙ্গবিকৃতি নেই এমন রোগীকে চিহ্নিত করে নাম নথিভুক্ত করা	২৫০/-
.	করে নাম নথিভুক্ত করা	চাক্ষুষ অঙ্গবিকৃতি আছে এমন রোগীকে চিহ্নিত	২০০/-

Sl. No.	উৎসাহভাতা	বর্ণনা	টাকা
২	কুষ্ঠ রোগীদের চিকিৎসা সম্পন্ন করলে ভাতা	· প্রতি P.B. কুষ্ঠরোগী পিছু ভাতা দেওয়া হয়। · প্রতি M.B. কুষ্ঠরোগী পিছু ভাতা দেওয়া হয়	৪০০/- ৬০০/-
জাতীয় বাহক সংক্রমিত রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি			
৩	রক্তের স্লাইড বা **র‍্যাপিড** ডায়গনস্টিক টেস্ট করানোর ভাতা	রক্তের স্লাইড **র‍্যাপিড** ডায়গনস্টিক টেস্ট	১৫/-
৪	রক্তে প্লাসমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম বা প্লাসমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স পাওয়া গেলে তার চিকিৎসা ব্যবস্থা করানোর জন্য ভাতা	রক্তে ম্যালেরিয়ার এই ভাইরাসগুলি পাওয়া গেলে নির্দিষ্ট ওষুধ দিয়ে সম্পূর্ণ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা	৭৫/-
৫	কালাজ্বর আক্রান্তদের নিশ্চিত ভাবে প্রতিপন্ন করার পর চিকিৎসা	আক্রান্তদের রেফার এর পর যত জন নিশ্চিত ভাবে প্রতিপন্ন হবেন এবং সরকারী হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা সম্পূর্ণ করবেন, সেই মাথাপিছু	

Sl. No.	উৎসাহভাতা	বর্ণনা	টাকা
	ব্যবস্থা করানোর জন্য ভাতা।	আশাকর্মী ভাতা পাবেন।	৫০০/-
৬	অ্যাকিউটএন কে ফ্যালাইটিস সিন্ড্রোম বা জাপানী এন কে ফ্যালাইটিস ভাতা	যাঁদেরকে এই রোগের জন্য রেফার করা হবে এবং যতজন এই রোগে নিশ্চিত ভাবে প্রতিপন্ন হবেন সেই অনুযায়ী মাথা পিছু ভাতা প্রদান।	৩০০/-
৭	সংশোধিত জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রন কর্মসূচী	এলাকায় নতুন যক্ষ্মা রোগী বা চিকিৎসার মধ্যে থাকা রোগীকে ডটসের ওষুধ খাইয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ করে সুনিশ্চিত করা ।	১০০০/-
৮	জাতীয় আয়োডিনের অভাবজনিত রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী	বাড়ি ভিজিট করে আয়োডিনের অভাব আছে এমন রোগীদের মধ্যে সচেতনতা গড়েতোলা ও আয়োডিন যুক্ত লবনের ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ও মাসে “লবণ পরীক্ষার কিট” ব্যবহার করানো ন্যূনতম ৫০ টি লবনের নমুনায় আয়োডিনের মাত্রা যাচাই করে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া এই কাজটি সম্পন্ন করা	২৫/-

Sl. No.	উৎসাহভাতা	বর্ণনা	টাকা
৯	জাতীয় ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, কার্ডিও-ভ্যাসকুলার রোগসমূহ স্ট্রোক প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (NPCDCS)	· ৩০ বছর বা তার বেশি বয়সী প্রত্যেক ব্যক্তির তালিকা প্রস্তুত করা। · তালিকায় থাকা ব্যক্তিদের কমিউনিটি বেসড অ্যাসেসমেন্ট চেকলিস্ট (CBAC) সম্পূর্ণ করা। · তালিকায় থাকা ব্যক্তিদের অসংক্রামক রোগের জন্য স্ক্রিনিং নিশ্চিত করলে প্রতি অসংক্রামক ব্যক্তি পিছু ভাতা পেয়ে থাকেন	১০/-
১০	স্ক্রিনিং টেস্টের পর সম্পূর্ণ চিকিৎসা হলে ভাতা	স্ক্রিনিংএ উচ্চ রক্তচাপ/ডায়াবেটিস/ ক্যান্সার হলে রোগীকে চিকিৎসা করিয়ে, পরের ৬ মাস নির্দিষ্ট চিকিৎসা করান সুনিশ্চিত করলে রোগী পিছু ভাতা পাওয়া যায়	৫০/-
গ] ১	নির্দিষ্ট এলাকায় জনসমীক্ষা করার ভাতা	বছরে ২ বার নির্দিষ্ট এলাকায় জনসমীক্ষা করে পরিবারের তথ্য লিখে রাখবেন	৩০০/-
২	গ্রামস্তরে জনগোষ্ঠীর সাথে মাসে নূন্যতম ২ টি আলোচনা সভার আয়োজন	গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস, আউটরীচ সেশন এগুলি বাদে কিশোর কিশোরীদের সঙ্গে বয়ঃসন্ধি-কালীন স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা , নিয়মানুযায়ী মাসে কমপক্ষে ২ টি আলোচনা সভার ব্যবস্থা এবং অংশ	

Sl. No.	উৎসাহভাতা	বর্ণনা	টাকা
		গ্রহণকারী দের স্বাক্ষর ও সভার বিবরণ সঠিক ভাবে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে দিলে মাসিক একটি ভাতা পাওয়া যায়	১৫০/
৩	গর্ভবতী মা ও ২ বছর বয়সী শিশুদের মায়েদের তালিকা ও তাদের সভায় নিয়ে আসার জন্য ভাতা	নামের তালিকা তৈরি করে তাদেরকে কম পক্ষে মাসে ৩ টি আলোচনা সভা এবং প্রতি ত্রৈমাসিক নূন্যতম ৯-১০ টি আলোচনা সভার আয়োজন করা, তাঁদের স্বাক্ষরের সঙ্গে সভার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে এন এম কে জানালে ৩ মাসে একটি ভাতা পাওয়া যায়	১০০/-
৪	মাসের ৩য় শনিবার উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে মিটিংএ উপস্থিত থাকার ভাতা	এই মিটিং এ প্রত্যেক আশাকর্মী এন এম এর সাথে (আগের মাসের ২১ তারিখ থেকে বর্তমান মাসের ২০ তারিখ পর্যন্ত) কাজের তথ্য বিনিময় করে থাকেন। যেমন- ওষুধ দেওয়া, রেকর্ড মেন্টেন করা , মাসিক রিপোর্ট জমা দেওয়া ইত্যাদি। সেই অনুযায়ী আশার মাসিক উৎসাহ ভাতা নিরধারিত হয়। এই মিটিং এ উপস্থিত থাকার জন্য একটি ভাতা দেওয়া দেওয়া হয়ে থাকে।	১৫০/-

Sl. No.	উৎসাহভাতা	বর্ণনা	টাকা
জননী সুরক্ষা যোজনার আওতাভুক্ত নন এমন গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে আশাদের জন্য অনুমোদিত উৎসাহ ভাতা সমূহ			
১	১২ সপ্তাহের মধ্যে নাম নথিভুক্ত করণের জন্য ভাতা	জননী সুরক্ষা যোজনায় অন্তর্ভুক্ত নন এমন গর্ভবতী মহিলার নাম ১২ সপ্তাহের মধ্যে নথিভুক্তকরণ ও সমস্ত গর্ভকালীন পরিষেবার সাথে হাসপাতালে প্রসব সম্পন্ন করলে ১ টি ভাতা দেওয়া হয়।	১০০/-
২	১২ সপ্তাহের মধ্যে নাম নথিভুক্ত করা গর্ভবতী মায়েদের সম্পূর্ণ গর্ভকালীন পরিষেবা প্রদানের ভাতা	গর্ভকালীন পরিষেবা (কমপক্ষে ৪ টি গর্ভকালীন পরীক্ষা, ১৮০ টি আয়রন ও ফলিক অ্যাসিড বড়ি, টিটেনাস ডিপথেরিয়া ইঞ্জেক্সান {২টি অথবা বুস্টার} রক্তপরীক্ষা, মূত্রপরীক্ষা) সুনিশ্চিত করা ও নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে থেকে আসা গর্ভবতী মহিলাদের এই সম্পূর্ণ পরিষেবা প্রদান করলে মহিলা পিছু এই ভাতা পাওয়া যায়।	২০০/-
৩	গর্ভবতী মহিলা কে সরকারী হাসপাতাল বা	কমিউনিটি বেসড ডেলিভারি সেন্টারে (CDC) গিয়ে ভর্তির ব্যবস্থা করা, এর জন্য মহিলা পিছু একটি	

Sl. No.	উৎসাহভাতা	বর্ণনা	টাকা
	আয়ুষ্মতী প্রকল্পের অন্তর্গত স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তির ব্যবস্থা করানোর জন্য উৎসাহ ভাতা	ভাতা দেওয়া হয়	৩০০/-

গবেষণার ফলাফল - কী দেখলাম

'গবেষণার মেথডস' বিভাগেই আমরা উল্লেখ করেছি কলকাতার পার্শ্ববর্তী তিনটি জেলার পাঁচটি ব্লকের ২১ জন আশাকর্মীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়। আশাকর্মীরা পরিবারকল্যাণ ও জন্মনিয়ন্ত্রণ নিয়ে কাজ করে পরিবারে স্বাস্থ্য সচেতনতা গড়ে তোলেন। ২১ জন আশাকর্মীর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেয়ছি তাঁরা সর্বাধিক দু'ই সন্তানের জননী। সন্তানদের লেখা পড়াশুনার ব্যপারে এঁদের প্রবল আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। সামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আশাকর্মীর ছেলেমেয়েদের, বিশেষ করে মেয়েদের পড়াশুনায় আগ্রহ খুব বেশি। একাধিক মেয়ে নার্সিং- এ পড়াশুনা করে নার্সিং এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এক জন আশাকর্মীর ছেলে বিদেশে থাকে। কেন এই পেশায় এসেছেন এ প্রসঙ্গে অনেকেই জানিয়েছেন লেখাপড়া শিখে নিজে কিছু করতে চেয়েছিলেন। তবে একটা বড় অংশের কাছে আর্থিক দুর্বলতার কারণে এই কাজ খুবই গুরত্বপূর্ন। যখন এই আশাকর্মীর দল কাজে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের মাসে ৮০০ টাকা ভাতা ছিল ।

আমার নিজস্ব একটা পরিচিতি বেড়েছে

বাড়ির মহিলাদের বাইরে কাজের ব্যপারে পরিবারের খুব বেশি বিরোধিতা দেখা যায় না। মেয়েরা অনেক ক্ষেত্রেই তাহলে বাইরের কাজ নেয় কারণ তাঁর রোজগার বাড়ীর প্রয়োজন। যদি দরকারটা বেশী হয় তাহলে পরিবার যে কোনো শর্তে বাড়ীর মেয়েকে বাইরে কাজে পাঠাতে দ্বিধা করে না। যেমন দক্ষিণ ২৪ পরগণার এক আশাকর্মীর অভিজ্ঞতা শুনুন, "আমার বাড়িতে, মানে শ্বশুরবাড়িতে, খিড়কি থেকে সদরে আসার হুকুম ছিল না। খিড়কির মধ্যেই থাকতাম, যখন বাপের বাড়ি যেতাম তখন যা বার হতাম। বাড়ির বউ বাইরে যাবে কেন ? আমার শ্বশুর ছিলেন প্রাইমারি স্কুল টিচার, তারপরে হঠাৎ করে ছেলের বিয়ের সাড়ে ৩ বছর পরেই , আমার স্বামী মানসিক রুগী হয়ে গেলেন। তখনি আশাকর্মী পদের বিজ্ঞাপন বেরল। আমি আবেদন করি এবং কাজটা পেয়ে যাই। এই কাজ যেন নতুন করে জীবন ফিরে পাওয়া। এই কাজ ছাড়াও টিউশন করি। এখন সারা পাড়া ঘুরে বেড়াতে পারি। আমার তো অনেকটা সাহায্য হয়েছে কারণ মেয়ের জন্য বা স্বামীর জন্য কারোর কাছে হাতপাততে হয় না।

নিজেদের প্রয়োজনটা এখন নিজেরাই মিটিয়ে নিতে পারি। যখন কলেজে পড়তাম তখন গল্পের বই পড়ার খুব নেশা ছিল, এখন সময় পাই না এবং এখানে কোন লাইব্রেরিও নেই। গল্পের বই পড়তে খুব ইচ্ছা করে" । এই গল্প অনেক আশাকর্মীর জীবন কাহিনী। এই গল্পে বেড়া ভাঙ্গার কিছু দীর্ঘ মেয়াদি প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

আশাকর্মীদের অনেকেই মনে করেন তাঁদের নিজস্ব একটা পরিচিতি বেড়েছে। এক আশাকর্মীর কথায় " ১০ বছর আগে যখন যেতাম বলত দাসেদের বাড়ির মেয়ে যাচ্ছে আর এখন বলে দিদিমনি যাচ্ছে, দিদি এটা কী করব ? বা দিদি আমার এটা সমস্যা হচ্ছে আমি এটা কী করব ? সেই সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা সাহায্য করি , আর যখন পারিনা আমাদের উপরমহলে দিদিরা আছেন এ. এন. এম. দিদি আছেন, ডাক্তারবাবুরা তারা সমাধান বলে দেন। এখন রাস্তায় বেরলে শুধু মা নয়, একটা ছোট বাচ্চা শিশু পর্যন্ত দিদি বলে সম্বোধন করে, এই সম্বোধনটুকু করে, খুব ভাল লাগে" ।

পরিবারে **সিদ্ধান্ত** নেওয়ার ক্ষমতা বেড়েছে। সমাজে কাজের পরিচিতি বেড়েছে, পরিবারেও সম্মান বেড়েছে। এই কাজের ফলে যে রোজগার হয়েছে তা থেকে

ছেলেমেয়েদের শিক্ষার উপর খরচ করে এই কর্মীরা পরিবারে উন্নতির জন্য দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ করতে পেরেছেন। পরিবারের যে কোন বড় সিদ্ধান্ত যেমন সন্তানদের শিক্ষা হোক বা বিবাহ এঁরা এখন তাতে সমান ভাবে যোগ দিতে পারেন বা একক ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এই সক্ষমতা এক দিকে আত্মশ্লাঘার বিষয়; অন্য দিকে, গ্রাম জীবনে অন্য মহিলাদের তুলনায় তাঁদের কথা বলা, মতপ্রকাশ করার যে স্বাধীনতা বৃদ্ধি পেয়েছে তা লক্ষ্যনীয়। দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের শেষে আশা কর্মীর কথায় "পুরুষপ্রধান সমাজে এইটুকু স্পেস তৈরি করতে পেরেছি। এটাই সবচেয়ে বড় পাওনা"।

আশা কর্মী হিসাবে কাজ যোগ দিতে যদিও শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণী , আমরা যাঁদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি তাঁদের মধ্যে নূন্যতম শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চ মাধ্যমিক। তবে বেশির ভাগই স্নাতক। একজন এম.এ. ও বি. এড. করে আশাকর্মীর কাজ করছেন। ভারতবর্ষে কাজে মেয়েদের অংশগ্রহণ মাত্র ২৫ শতাংশ। এই কারণেই অনেক উচ্চশিক্ষিত মহিলাকেই তাঁদের যোগ্যতার নিরিখে অনুপযুক্ত কাজে

যোগ দিতে বাধ্য হতে হয়। তখন সামাজিক মাধ্যমের এই দাপাদাপি ছিল না, বেশির ভাগ আশাকর্মী মূলত পঞ্চায়তের মাধ্যমে এই কাজের খবর পেয়েছিলেন। এক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পরিবারের কোন সদস্যের সঙ্গে পঞ্চায়তের যোগাযোগের কারণে অনেকেই এই সুযোগের কথা জানতে পারেন। এক জন আশাকর্মী ছাড়া বেশির ভাগই ৮-১০ বছর ধরে এই কাজ করছেন। নিয়ম অনুসারে নিজের গ্রামেই কাজ করতে হবে - হেঁটে বা সাইকেল করে যাতে কাজটা করা যায়। পশ্চিমবঙ্গ যেহেতু খুবই ঘনবসতি পূর্ন রাজ্য, আশাকর্মী প্রতি ১০০০ থেকে ১২০০ জনসংখ্যার একটা বা একাধিক পাড়ার দেখভাল করতে হয়। কাজে যোগ দেওয়ার আগে কিছু প্রশিক্ষণ নিতে হয়, এবং প্রতি বছর বিভিন্ন সময় সকলেই প্রশিক্ষণ পেয়েছেন - একাধিক বার।তবে কাজের জায়গায় বেশি শেখার সুযোগ।

একাধিক গবেষণায় দেখা যায় কাজের জন্য মেয়েদেরকে বাইরে বেরতে হলেও সমানভাবে সন্তানের দেখাশোনা ও বাড়ির কাজও করতে হয়। বাড়ির ও বাইরের কাজের বোঝার চাপে অনেক মেয়েদের শ্রমবাজার থেকে ছিটকে যেতে হয়।

গবেষণারা অংশ হিসাবে আমরা প্রতিটি আশাকর্মীর সারাদিনের রুটিন জানতে চেয়েছিলাম। গ্রামের দিকে সাধারণ ভাবে দিন একটু সকাল সকাল শুরু হয়, তবে আশাকর্মীর কাজে বেরনোর প্রস্তুতির জন্য আরও একটু আগেই দিন শুরু হয়। তাঁদের ঘুম থেকে ওঠার সময় ভোর চারটে বা পাঁচটা। কয়েক জন মাত্র একটু দেরি করতে পারেন। সকাল দশটার মধ্যে বাড়ির কাজ শেষ করে, প্রতি বাড়িতে ভিজিট শুরু হয়ে যায়। সকালে বাড়ির কাজের মধ্যে স্বামী ও সন্তানের প্রাতরাশ থেকে শুরু করে যাঁদের স্বামী বাইরে কাজে যাবেন, তাঁর জন্য টিফিনের প্রস্তুতি – সবই শেষ করতে হয়। এক আশাকর্মী সকালের বর্ণনা দিতে গিয়ে জানান - "আমিতো ওই ভোর ৪ টের সময় উঠি। আজকে বলে না চিরকালই উঠি , যেহেতু হাজবান্ডের টিফিন তাড়াতাড়ি রেডি করে দিতে হয়। উঠতে হয়, রান্না করতে হয়, টিফিন বানাতে হয়। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ওঁদের মর্নিং ছিল শিফট ছিল তো, সেটাও করতে হতো। সেগুলোতো আছেই , মোটামুটি সাড়ে ৭ টার মধ্যে রান্নাবান্না হয়ে যায়"

বাড়ির কাজে পুরুষদের কী ধরনের সাহায্য পান? 'সংসার সুখী হয় রমণীর গুনে'

এই ধরনের প্রবাদের সামাজিকীকরণের ফলে বাড়ির কাজের দায়িত্ব মেয়েদের উপর বর্তায় এবং মেয়েরাও এটাকেই ভবিতব্য বলে মেনে নিতে শেখেন। গৃহস্থালির কাজে পুরুষ মানুষের যোগ না দেওয়ার কারণ মেয়েরাও সমর্থন করেন, যেমন এক আশাকর্মী জানালেন , " ও (স্বামী) তো ঘরের কাজ একদম পারে না, তাই আমাকেই সব করতে হয়"। অন্য এক আশাকর্মী , নাজমা দিদির (নাম পরিবর্তন) কথায়ঃ "কোন কোন দিন সাড়ে ৪টা হয়, কোন দিন ৫টা, কোন ঠিক নেই...সংসারের সমস্ত কাজ, ঘর সামলে রেখে বাইরে বেরোনো... সংসার সামলে রান্না করে বেরোতে হয় । সব সব টোটাল। জামাকাপড় পরিস্কার থেকে ঘর পরিস্কার। স্বামী যখন সময় পায় তখন হাত দেয়, মানে করে না যে তা নয়, করে। তারপরে আমার ফিল্ডে তো যেতেই হয়, যে ধরনের কাজ, সেরে এসে আবার সেই সংসারের সেই কাজ, তারপর বাচ্চা আছে তাকে পড়ানো, টিচারের কাছ থেকে ফিরে আসলে যে কাজ হয় সেটা করানো, তারপর নিজেদের কাজও আছে যে খাতাগুলো আছে সেগুলো মেন্টেন করতেই হয়"

সপ্তাহে প্রতি বুধবার সাব-সেন্টারে যেতে হয়। সেন্টারে রিপোর্ট-এর কাজ ছাড়াও অনেক সময় গর্ভবতী মা'কে সঙ্গে নিয়ে সেন্টারে আসতে হয় স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরামর্শের জন্য। করোনা-পূর্ব সময়ে মাসে একবার ব্লক অফিসেও মিটিং-এ হাজির হতে হত।

আশাকর্মীদের কাজের ক্ষেত্র মূলত কমিউনিটি স্তরে অর্থাৎ ফিল্ডে গিয়ে একেবারে প্রতিটি দুয়ারে গিয়ে কাজ। প্রতিদিন গড়ে ২০ -২৫ টা বাড়ি ভিজিট করতে হয়। গর্ভবতী মায়েদের প্রতি নিয়মিত খেয়াল রাখা এবং তাদের স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলতে উৎসাহ দেওয়া। মা ও শিশুর টীকাকরণ নিশ্চিত করা। মাসে অন্তত দুবার কিশোর - কিশোরীদের সঙ্গে বয়ঃসন্ধির সমস্যা ও কৌতূহল নিয়ে মিটিং-এর আয়োজন করতে হয়। স্বাস্থ্য সচেতনামূলক সভা মাসে অন্তত চার বার আয়োজন করতে হয়। এর পাশাপাশি কুষ্ঠ , যক্ষ্মা নিরাময় ও এই বিভিন্ন টেস্টএর কাজে সহায়তা করা। যে-ধরনের প্রশিক্ষণ আশাকর্মীরা পান মূলত সেটা এই কাজের জন্য। আশাকর্মীদের কাজের অন্যতম দিক হল তাঁদের কাজের এলাকাতে একশ শতাংশ প্রাতিষ্ঠানিক

প্রসব নিশ্চিত করা। এই কাজ করতে করতে প্রসবকালে গর্ভবতী মায়ের সঙ্গী হতে হয়।

গর্ভবতী মায়েদের প্রতি নিয়মিত খেয়াল রাখা ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব নিশ্চিত করতে তাঁদের কাজের একটা তালিকা আমরা প্রস্তুত করতে পেরেছি।

- ❖ ১২ সপ্তাহের মধ্যে নাম নথিভুক্ত করতে হয়।
- ❖ ৪ টে চেকা আপ করতে হয়।
- ❖ ২ টি ডিটি দিতে হয়।
- ❖ তারপর রক্তচাপ, রক্তপরীক্ষা, মূত্রপরীক্ষা করতে হয়।
- ❖ ওজন নেওয়ার ফলে জানা যায় বাচ্চাটার কী রকম গ্রোথ হয়েছে।
- ❖ সাবসেন্টারে আসার পরামর্শ দিতে হয়।
- ❖ আউটরিচ ক্যাম্পের মাধ্যমে গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হয়।
- ❖ বাড়ি বাড়ি ভিজিট করতে হয়।
- ❖ কীভাবে তাদের বিশ্রামে থাকতে হবে পরামর্শ দিতে হবে।
- ❖ গর্ভবতীর খাওয়াদাওয়া কী হবে তা নিয়ে নিয়মিত পরামর্শ দিতে হবে।

- কি কি বিপদের লক্ষণ হতে পারে সে সব বিষয়ে বলতে হয়।
- প্রসব কালে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়।
- জন্ম প্রামাণ পত্র তৈরি করতে হয়।
- শিশুর টিকাকরনের সাহায্য করতে হয়।
- মা ও শিশুর পুষ্টি নিয়ে নিয়মিত পরামর্শ দিতে হয়।
- স্বাস্থ্যবিষয়ক নানা তথ্য সংগ্রহ করতে হয়।

আশাকর্মীদের রুটিন কাজের মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল স্বাস্থ্যবিষয়ক নানা তথ্য সংগ্রহ করা। এঁরা সরকারের একবারের প্রথম সারির তথ্যসংগ্রাহক হিসাবে কাজ করেন, অথচ এই তথ্যের ব্যবহার কীভাবে হয় এ নিয়ে তাঁদের কোনও স্বচ্ছ ধারনা নেই। কত রকমের খাতায় হিসাবে রাখতে হয় এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে ঐক্যমত্য নেই, তবে কথা বলে আমরা একটা তালিকা তৈরি করতে পেরেছি।

- এন সি , পি এন সি- বাচ্চা যখন গর্ভাবস্থায় থাকে।
- চাইল্ড ইমিউনাইজেশন।
- জন্ম ও মৃত্যু হিসাবের খাতা।
- এলিজেবেল কাল খাতা।
- ব্লাড স্লাইড খাতা।
- জন্ম নিয়ন্ত্রণ অনুযায়ী পরিবার পরিকল্পনা খাতা ।
- আয়রন খাতা।
- ২ টি মিটিং এর খাতা।
- গ্রামস্তরে জনগোষ্ঠীর সাথে মিটিং এর খাতা।
- কিশোরীদের মিটিং-এর খাতা।
- ৩ মাসে ৯টি মিটিং হয় যেমন গর্ভবতী মায়ের সাথে ২ বছরের বয়সী বাচ্চাদের নিয়ে মিটিং তার খাতা ।
- এম সি ডি খাতা ।
- লেপ্রসি খাতা ।

- মেডিসিন খাতা।
- ডিউ লিস্ট খাতা।
- আর প্রসবের জন্য যে মহিলারা ভর্তি হন তাঁদের রেকর্ড ।
- ডেলি ডাইরি।

হাসপাতালে প্রশিক্ষণ

হাসপাতালে আশা কর্মীদের অভিজ্ঞতা অনেক সময় খুব দুঃসহ হয়। আশা কর্মীদের সঙ্গে হাসপাতালের সম্পর্ক ভালো করতে এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থার সঙ্গে পরিচয় ঘটানোর জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে 'দিশা' বলে এক প্রকল্পের সূচনা হয়। এছাড়া আশা কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্বাস্থ্য কর্মী হিসাবে তুলে ধরতে দিশার সূচনা। এই প্রকল্প অনুসারে আশাকর্মীদের বছরের একটা সময় একমাস হাসপাতালে ডিউটি করতে হয়। ১ মাস মে' আই হেল্প ইউ' ডিউটি পড়ে কাজের মধ্যে ওখানে কোন সময়ে কোন মা ভর্তি হল তার রেজিস্টার মেন্টেন করা – নাম, তথ্য লেখা, লেবার রুমেও থাকতে হয়। প্রশিক্ষণ ছাড়াও হাসপাতালে ডিউটি করতে হয়। দিন ও

রাতের শিফটে কাজ করতে হয়। দুটি জেলার (হাওড়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা) আশাকর্মীদের দিশা'র কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিজ্ঞতা একেবারে তিক্ত। 'দিশা'-র বার্ষিক এই যন্ত্রণা থেকে আশাকর্মীরা অব্যহিত চান। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন বলে তাঁদের মনে হয়।

রুটিনের বাইরের কাজ।

স্বাস্থ্যবিষয়ক রুটিন কাজের বাইরেও পঞ্চায়েত ও ব্লকের প্রশাসনিক কাজের সঙ্গে আশাকর্মীদের যুক্ত হতে হয়। বছরের বিভিন্ন সচেতনতা মূলক বিভিন্ন প্রচার অভিযানে আশাকর্মীরা যুক্ত থাকেন। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতি ও স্বাস্থ্যরক্ষার কী কী চাহিদা হতে পারে এই বিষয়ে আশাকর্মীরা সরকারের প্রথম সূত্র।

উত্তর চব্বিশ পরগনার আশাকর্মী জানালেনঃ

“হ্যাঁ এই আম্ফান, বুলবুল মারাত্মক মারত্মক ঝড় বন্যায় মানুষ বাড়ি থেকে বেরোতেই পারেনি কিন্তু আমাদের যেতেই হবে সেই নদী গঞ্জ কোথায় ভেঙ্গেছে কী হয়েছে সেখানকার মানুষেরা কোথায় আছে ? তারা ঠিক মতো পরিষেবা পাচ্ছে কীনা ? কী

খাচ্ছে ? মানে এ টু জেড সমস্ত তথ্য আমাদের দিতে হয় এবং রিপোর্টও আমাদের কন্টিনিউ করতে হয়" । এছাড়া প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা বাড়াতে নানা পদক্ষেপ নিতে হয়"

"রিপোর্ট তৈরি করতে হয়... যেমন ঝড়ের সময় ইলেক্ট্রিক চলে যায়"

"জলের সমস্যা কি কি ধরনের চ্যালেঞ্জ ফেস করতে হয় ? তখন কি করেন" ? যখন জলের সমস্যা হয় তখন বলি জল নিয়ে এসে ওটা ফুটিয়ে খাও , হালজেন দেওয়া, ও. আর. এস. দেওয়া এগুলো দিয়ে তাদের হেল্প করা হয়"।

প্রশাসনিক কাজের মধ্যে প্রায় ৬০ শতাংশ ক্ষেত্রে আশাকর্মীরা বলছেন, তাঁদের ভোটের কাজ যেমন ভোটার তালিকা সংশোধন বা ভোটের দিনে গর্ভবতী মহিলারা যাতে সুরক্ষিত ভাবে ভোট দিতে পারেন, এই নিয়ে সজাগ থাকতে হয়, এই কাজের জন্য নির্বাচন কমিশন থেকে সামান্য ভাতাও পেয়ে থাকেন।

করোনা কালের কাজ

প্রাথমিক ভাবে দেশ জুড়ে লকডাউন শুরু হয় মার্চের শেষ দিকে। আগের বিভাগে

আশাকর্মীদের 'রুটিন' কাজ নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। লক লকডাউন শুরুর সঙ্গে সঙ্গে মূলত physical contact দূর করতে ও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে সরকার 'রুটিন' কিছু কাজ বন্ধ করে দিয়ে বাধ্য হয়। এই কারণে দু মাসের জন্য শিশুর টীকাকরণ বন্ধ হয়ে যায় (এপ্রিল - মে 2020) । টীকাকরণ পিছিয়ে গেলে শিশুর ক্ষতির সম্ভাবনার কথা ভেবে জুন মাস থেকে পুনরায় শিশুর টীকাকরণের কাজ শুরু হয়। দুমাসের অধিক সময় ধরে টীকাকরণের কাজ বন্ধ থাকায় টীকাযোগ্য শিশুর তালিকা বেশ লম্বা হয়ে যায়। সরকারি নির্দেশ অনুসারে সামাজিক দূরত্ব মেনে টীকাকরণের কাজ শুরু হয়। তবে অন্তত পাঁচ বার অল্প শিশু নিয়ে টীকাকরণের ব্যবস্থা হয়। আশাকর্মীরা মনে করেন সরকারের তড়িঘড়ি টীকাকরণের ব্যবস্থার ফলে শিশুর দল কোন বড় সড় বিপদের হাত থেকে বাঁচতে পেরেছে। লকডাউন-জনিত টীকাকরণের যে ঘাটতি দু মাসে হয়েছিল তা অনেকটা আশাকর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টায় মেটানো হয়েছে বলে স্বাস্থ্য আধিকারিকরা মনে করেন।

রুটিন' কিছু কাজের সাময়িক বিরতি হলেও করোনাকালে আশাকর্মীদের কাজের পরিধি অনেক খানি বেড়ে যায়। কাজ নিয়ে আলোচনার আগে আমরা অতিমারি রুখতে আশাকর্মীদের কী ধরনের প্রস্তুতি, প্রশিক্ষণ ও সুরক্ষার ব্যবস্থা ছিল, তাও জানতে চেষ্টা করি। করোনার কথা আশাকর্মীরা প্রথম শুনতে পায় মূলত সংবাদ মাধ্যমের কাছ থেকে অথবা এ এন এম দিদির কাছে। করোনার প্রথম কোন ঘটনা তাঁদের মনে আছে? লকডাউনের ঘোষণা আকস্মিক ভাবেই হয়, স্বাস্থ্য দপ্তর আলদা ভাবে কোন প্রশিক্ষনের আয়োজন করার সুযোগ পায়নি। অতিমারি মোকাবিলা কি কৌশলে হবে এই ব্যপারে এ এন এম দিদি মারফত নির্দেশকেই তাঁরা পালন করেছেন। প্রথম দু মাস সুরক্ষার জন্য স্যানিটাইজার ও মাস্ক পাওয়া যায়নি। তবে মে মাসে ইমিউনাইজেন শুরু হল যখন, তখন মাস্ক গ্লাভস, স্যানিটাইজার পাওয়া গিয়েছিল। পরে গ্লাভস, হেডশিল্ড ও দেওয়া হয়েছিল। কিছু জায়গায় NGO দের সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল। আশাকর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার কথা ভেবে করোনা টেস্ট আশাকর্মীদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। মাসে ২ বার করে ক্যাম্প হয়,

প্রত্যেক মাসে টেস্ট হয়। অনেকেই জানিয়েছেন টেস্ট না করলে শোকজ এর ভয় ছিল। বছরের অন্য সময়ের চেয়ে করোনার সময়ে হোম ভিজিট বেশি হত, দিনে কম পক্ষে ৪০ থেকে ৫০ ঘর যেতে হত। দিনে ৩-৪ ঘন্টার বদলে ফিল্ডে ৫-৬ ঘণ্টা কাটাতে হত। আশাকর্মীদের অনেকেই বলেছিলেন " আমাদের কাজ সাত দিন রাত দিন"।

কাজের সময়সীমা ও ধরন বেড়ে গেলে কাজ বেশি, অথচ রুটিন কিছু কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উৎসাহ ভাতা কমে যায়। তবে করোনাকালে ছ মাসের জন্য ১০০০ হাজার টাকা অতিরিক্ত ভাতা দেওয়া হয়েছিল, এই কথা স্বাস্থ্যকর্মীরা স্বীকার করেছেন।

কোভিড নজর দারি।

স্বাস্থ্য ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় আশাকর্মী সরকার ও কমিউনিটির মধ্যে যোগাযোগের সবচেয়ে সবল মাধ্যম। আশাকর্মীররা প্রতিটি পরিবারের একবারে হাঁড়ির খবর রাখেন। অতিমারি রুখতে প্রথম করোনার লক্ষণযুক্ত মানুষকে শনাক্তকরণ বা '

কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং এর কাজে দেশ জুড়ে আশাকর্মীদের কাজে লাগানো হয়। সরকারি নির্দেশনামা অনুসারে, প্রতিদিন ৪০ -৫০ ঘর বাড়িতে গিয়ে আশাকর্মীরা খোঁজ নেন এবং নিম্ন লিখিত বিষয় গুলো নথি ভুক্ত করেনঃ বাইরে থেকে কেউ এসেছে কিনা? এবং বাড়ির কেউ বাইরে গেছে কিনা এবং সে কতদিন পর ফিরবে? বা কেউ এলে কতদিন আগে এসেছে? তার নাম জানা, ফোন নং নেওয়া, তার জ্বর সর্দিকাশি, অসুস্থতা তার কোনও রোগ আছে কিনা? এই সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে এ.এন.এম.-কে নিয়মিত রিপোর্ট করতে হয়েছে। কোনও ব্যক্তির করোনার লক্ষণ জানতে পারলে করোনার টেস্টের ব্যপারে উৎসাহ দেওয়া ও কোথায় হবে এই সব প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে হয়েছে। বাড়ি বাড়ি তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে আশাকর্মীদের অদ্ভুত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে, অনেক সময় হেনস্থার শিকার হতে হয়।

আতঙ্কের কারনে জ্বর বা সর্দি কাশি হলে অনেকে আশাকর্মীর কাছে তথ্য চেপে যেতেন । এ রকম এক অভিজ্ঞতার কথা - “যখন আমরা বাড়িতে বাড়িতে ভিজিট করতাম যদি জিজ্ঞাসা করতাম জ্বর আছে? মহিলা হয়ত বলল হ্যাঁ, ভিতর থেকে স্বামী

হয়ত বলছে অ্যাই তোমার জ্বর হয়েছে? কে বলল তোমার জ্বর হয়েছ ? মানে ভয় পেত" । ... জ্বরটা তখন এমন একটা... মানে আমার যখন জ্বর হয়েছিল সেই সময় আমার ওখানে সব টেস্ট হয়েছিল..... আমার জ্বর হয়েছে টেস্ট করতে গেছি এমনিতে তো কেউ পাশে বসতে একটুখানি হেজিটেট (দ্বিধা) করছিল তাছাড়া পুরো জয়নগর ব্লক জানতে পেরে গেছে যে আমার জ্বর হয়েছে। তারা ধরেই নিয়েছে যে আমার কোভিড... হ্যাঁ এ রকমই।"

অনেক ক্ষেত্রে পাড়ায় করোনার লক্ষণযুক্ত ব্যক্তির সন্ধান পেলে সেখানকার মানুষ আশাকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা নিয়ে অনুরোধ বা চাপসৃষ্টি করতেন। মানুষ আতঙ্কে এক দিকে দিশেহারা অন্য দিকে সরকারের তরফ থেকে আশাকর্মী ছাড়া গ্রাম স্তরে অন্য কোনও সরকারি আধিকারিক কে না পেয়ে আশাকর্মীদের উপর মানুষের প্রত্যাশা বেড়ে যায়। আশাকর্মীদের সঙ্গে দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে এই ধরনের অনেক অভিজ্ঞতা শুনতে পাওয়া গিয়েছিল। এক আশা কর্মীর কথায়-

"আমার সব থেকে অসুবিধা হয়েছিল যখন প্রথম প্রথম কোনও তো কিছু টেস্টের

ব্যবস্থা ছিল না .... এরকম হয়েছিল আমার এলাকায় একজনের জ্বর হয়েছিল বৃষ্টিতে ভিজে বাড়ির লোকেরা এটাই জানিয়েছিল উনি পরের দিন সকাল বেলা হঠাৎ মারা যান, তখন পুরো ফিল্ড উত্তাল হয়ে গিয়েছিল, সেইসময় দিদিকে জানাই। সুপারভাইজার খুব হেল্প করেছিলেন। সেই সময় আমি আবার দিদির সাথে কথা বলি, পদ্মাঘাটে টেস্ট হচ্ছিল ওই বাড়ির লোককে টেস্ট করতে পাঠিয়েছিলাম, ওঁনার বয়স্ক বাবা ছিলেন ওঁনারও জ্বর ছিল। উনি পদ্মাঘাটে গিয়ে মারা গেলেন। মানে এক বাড়ি থেকে ২জন পর পর ২দিন মারা গেল। সেইসময় যে কী অবস্থা হয়েছিল, অন্য সবাই আমাকে তো খেয়ে ফেলছেই এদের টেস্ট হয়েছে কী না কোভিড হয়েছে কী না, আমি কি করে বলব টেস্ট হয়নি? কী অবস্থাটাই না গেছে" ।

শহরে পাকাপাকি ভাবে বসবাস করেন এরকম এক পৌঢ় এই সময়ে গ্রামে ফিরে আসেন। প্রতিবেশীরা আতঙ্কিত হয়ে আশাকর্মীর উপর চাপ দিতে থাকেন কিছু একটা ব্যবস্থা নিতে। দুপর থেকে রাত গড়িয়ে যায় মানুষেকে শান্ত করতে। আশাকর্মীর নিজের বয়ানে ঘটনার বিবরণঃ

" ওই সময় বাইরে থেকে এসেছিলেন উনি, এখানে থাকতেন না, ওনার পৈত্রিক বাড়ি ওখানে আমার বাড়ি থেকে ২-৪ টে বাড়ির পরে, আমি ওখান থেকে ১২টার সময় ক্রস করেছি, উনি হয়ত এসে থাকেন কোনও সময় উপরে চাবি খুলে থাকেন আমি তো জানি না, ওনার পাশের বাড়ি থাকে ভাইয়ের বউ হবে, আমার কাছে এসেছে বলছে ও দিদি, এরকম ওই দাদা এসেছেন, কাশছেন। আমি বললাম হ্যাঁ এসেছেন তো কি হয়েছে? উনি থাকেন সল্টলেক না যাদবপুরে থাকেন আমি তো জানি এসেছেন তো কি হয়েছে? বলছে না উনি তো বাইরে থাকেন...উনি যেহেতু এখানে থাকেন না আমি খবর কি করে জানব? তো আমি জিজ্ঞাসা করলাম তো উনি থাকেন কোথায় বলল ওনার ফিক্সড থাকে না। বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ান। কাজ ওইরকমই বাইরের দেশে। আমি বললাম কখন এসেছে ? ওই ১টা দেড়টার সময় এসেছেন , এবারে আমি বললাম, অসুবিধাটা কি হয়েছে ? তখন বলছে, না দিদি, উনি কাশছেন...উপরের ঘরে কাশছেন। সমানে আমাকে বলছে, দিদি তুমি কিছু একটা ব্যবস্থা কর। এখন কী হবে? সঙ্গে সঙ্গে আমিও চুপ করে ছিলাম তারপর। এম এন দিদি কে বলেছি উনি বললেন

ঠিক আছে রাত্তির বেলা আর কিছু করতে হবে না। এবারে আমাদের এখানে এলাকা উন্নত বলছি না, কেউ একজন ফোন করে দিয়েছে ওখানে পদ্মাঘাটে, ওখান থেকে ফোন এসেছে সুপারভাইজারের কাছে। উনি আমাদের এম এন দিদিকে বলছেন মানসীর এলাকায় এমন হয়েছে। তখন রাত ৯ টা বাজে আমায় বলেছেন তুমি এক্ষুনি যাও, গিয়ে ডিটেলস নাও, ওঁর কাছ থেকে। আমি এবারে বলছি আমি তো এখন কিছু পরে নেই আমারও ভয় হচ্ছে, বলছে তুমি সব ঢেকে ঢুকে যাও। খুব গরম তখন তো মে জুন মাসে, গিয়েছি নিচ থেকে ডাকছি নামও তো জানি না , পাশের বউটা কে ডেকে নামটা জিজ্ঞাসা করলাম তারপর ডাকছি... উনিও না এমনি খুবই ভাল ভয় পাচ্ছেন। ক্লাবের ছেলেরা - কেউ বলছে দিদি, কেউ বউদি - বলছে তুমি একটা ব্যবস্থা কর ওনাকে এখানে রাখা যাবে না। আমি বলেছি দেখ আমি তাড়িয়ে দিতে তো পারি না। আমি বলতে পারি, জিজ্ঞাসা করতে পারি, এটুকুই, ওপর মহলে জানাতে পারি, এটুকুই সমানে ওদিক থেকে ফোন আসছে, পদ্মাঘাট থেকে। আমি সমানে বলছি যাচ্ছি ক্লাবের ছেলেরাও আছে। উনি জানলাটা খুলে কথা বলছেন তখন রাত ১১ টা

হবে, জিজ্ঞাসা করলাম আপনি টেস্ট করেছেন ? প্রথমে বলছেন আমি বাইরে থেকে আসিনি তখন বললাম বলছে এরা তারপর উনিও ভয় পেয়েছেন... তখন আমি বলেছি আপনি তো এয়ারপোর্ট থেকে এসেছেন, টেস্ট করেছেন? বললেন হ্যাঁ করেছি। কিন্তু পরিস্কার করে তো বলছেন না। তারপর এদিকে দাদারা, স্যাররা ফোন করছেন বলছেন আপনি জিজ্ঞাসা করে নিন সব। আমি বলেছি আমি আর পারছি না। তখন সাড়ে ১২ টা বাজে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না ছেলেরা উত্তেজিত হয়ে গেছে, আমি বললাম আপনি এক কাজ করুন ওনার টেস্ট করানর ব্যবস্থা করুন। আমাদের বি এম এইচ আসলেন প্রথমে বললেন, আমরা কেউ আসতে পারব না ওনাকে বলবে ভোরে যেতে। আচ্ছা ঠিক আছে তারপর আমি আবার স্যারকে ফোন করলাম, বাড়ি যাই। ছেলেরা ঘুমোচ্ছে এসে রুটিটা করছি সঙ্গে সঙ্গে ফোন এসেছে যে স্যার ঢুকেছেন। তখন রাত ১টা। আবার ইউনিফর্ম পরে গেলাম। উনি বলেন, ও তুমি? এস।দেখলাম, তখন ভদ্রলোক রিপোর্টটা বার করেছেন। আপনি টেস্টটা করেছেন তারপর কোথায় ছিলেন? ওনাকে তো যাদবপুরে বাড়ি বলছেন, ওখানে ছিলেন।

আপনাকে তো ওখানে থাকতে বলেছে।অ্যাড্রেসটা ওখানের। এখানে কেন? উনি বললেন,এটা তো পৈতৃক বাড়ি ওখানে বয়স্ক বাবা মা আছেন, ছেলে মেয়েরা আছে ওই জন্য এখানে চলে এসেছি। কিছু হোক আর না হোক আপনাকে ১৩ দিন আলাদা থাকতে হবে।”

কোভিডের সময় সার্ভে।

পশ্চিমবঙ্গে করোনার কারণে মোট মৃত্যুর ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে 'কো-মর্বিডিটি' যোগ থাকায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই জাতীয় অসুস্থতায় আক্রান্ত লোকদের শনাক্ত করতে 'কো-মর্বিডিটি' সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করে। সার্ভের মূল উদ্দেশ্য কত সংখ্যক মানুষ উচ্চ রক্তচাপ, কিডনির সমস্যা, ডায়াবিটিস, শ্বাসকষ্ট, লিভারের সমস্যা, ক্যানসারের মতো রোগে ভুগছেন, তার একটা চিত্র তুলে ধরা।

সেই তথ্য হাতে থাকলে তাঁদের কেউ করোনা আক্রান্ত হলে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করে চিকিৎসার আওতায় নিয়ে আসা সহজ হবে। গ্রামীণ এলাকায় বাড়ি

বাড়ি ঘুরে আশাকর্মী দিয়ে 'কো-মর্বিডিটি' সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। প্রতিদিন সেই রিপোর্ট জেলা স্বাস্থ্য দফতরের জমা দিতে হতো। সময়ের মধ্যে সেই কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, আশাকর্মীদের অতিরিক্ত সময় ধরে কাজ করতে হয়েছিল বলে অনেকেই জানিয়েছেন। এছাড়া স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের কাজ সারা বছরই আশকর্মীদের করে যেতে হয়।

ভিতর ও বাহিরের কাজ

আশাকর্মীদের কাজ মূলত বাড়ি বাড়ি ঘুরে মা -শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষার কাজ । ইনডোরে কাজের প্রথাগত প্রশিক্ষণ নেই যদিও। আমরা যাঁদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি এঁদের মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশ আশাকর্মীদের বছরে একবার করে 'দিশা' প্রকল্প অনুসারে হাসপাতালে কাজ করতে হয়। তবে এক মাসে অভিজ্ঞতা খুব একটা সুখপ্রদ হয় না। ইনডোর স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সঙ্গে কাজ করার শিক্ষার খুব বেশি সুযোগ হয় না বরং হেনস্থার শিকার হতে হয় বলে জানা যায়। দুটো জেলার (দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও হাওড়া

জেলার) ক্ষেত্রে বাড়ী থেকে দূরে আইসোলেশন সেন্টারে ডিউটি পড়েছিল। এই অস্থায়ী সেন্টার গুলোতে পরিযায়ী শ্রমিকদের ১৪ দিন কোয়রেন্টাইনে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। পরিযায়ী শ্রমিকরা যখন ফিরেছেন তাঁদের নাম নথিভুক্ত করা, কোথা থেকে ফিরছেন, এবং থার্মাল স্ক্রিনিং এর দায়িত্ব ছিল আশাকর্মীদের ওপর। এক জন আশাকর্মীকে সর্বাধিক তিন চার দিনের জন্য এই পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হতে হয়েছিল। অল্প সময়ের জন্য হলেও এই অস্থায়ী সেন্টারগুলোতে মহিলা হিসাবে কাজের অভিজ্ঞতা খুব খারাপ। রাজ্যে তখন শয়ে শয়ে পরিযায়ী শ্রমিক ফিরছেন। সরকারি নির্দেশ অনুসারে তাঁদের অস্থায়ী সেন্টার গুলোতে দু -সপ্তাহ কাটাতে হচ্ছে, অথচ এঁদের অনেকই সুস্থ। বাড়ির কাছে এসে নূন্যতম পরিকাঠামোর মধ্যে দিন কাঠাতে হচ্ছে। অপ্রতুল খাবার ব্যবস্থা ইত্যাদি নিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে এক আতঙ্কের পরিবেশ রচিত হয়। একশ - দেড়শ পরিযায়ী শ্রমিকদের দেখভালের দায়িত্ব পড়ছে তিন - চার আশাকর্মীর ওপর। প্রশাসনের অন্য বিভাগ হয় ফোন বা দূর থেকে আইসোলেশন সেন্টারগুলো পরিচালনা করছে।

এক আশাকর্মীর অভিজ্ঞতায় "রাত ৮ টা থেকে সকাল ৮ টা পর্যন্ত ডিউটি ছিল। ওখানে না আছে কোন টয়লেট না আছে জল মানে প্রচণ্ড কষট হয়েছিল। ২ দিন যেতে হয়েছিল, ৩ দিন আমরা আর পারিনি। সারারাত ধরে বাস আসছে। কিছু কিছু আমরা আবার রেজিস্টারও মেন্টেন করেছি"। আইসোলেশন সেন্টারগুলোতে ডিউটি পড়ার কারণে পরিবার গুলোতেও সমস্যা দেখা দিয়েছিল বিশেষ করে বাড়ি ছোট বাচ্চা আছে এমন পরিবারে।

"হ্যাঁ ওই রকমই বলেছিল। এলাকার মধ্যে দূরত্ব রাখা যায় কিন্তু এরকম একটা জায়গায় যাওয়া থেকে কাজ করা যেহেতু বাচ্চাটা আছে, বাচ্চাতো আর শুনবে না। আর ও দিক থেকে ফিরে আসার পরে দিদিও ফোন করে বারবার বলছিলেন তুমি কিন্তু বাচ্চার কাছে যাবে না। ২ দিন সেই নিয়ে সমস্যা তো হচ্ছিল আমাকে তো বাড়ির সমস্ত কাজ রান্না বান্না সবই করতে হয় ওই অবস্থায়... তো ওটা নিয়ে সমস্যা তো হয়েছিল"

করোনা আক্রান্ত আশা

করোনার প্রথম পর্বে যখন অনেকেই গৃহবন্দী, অথবা ঘর থেকেই কাজ করার সুযোগ পেয়েছিল, আশাকর্মীরা তখন করোনা মোকাবিলার প্রথম সারির কর্মী। কাজের জন্য অসংখ্য মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ হচ্ছে এবং বিশেষ করে পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করার ফলে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অনেক গুণে বেড়ে যায়। ২১ জন আশাকর্মীর মধ্যে ৫ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন। করোনার অতিমারি রুখতে তাদের গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা থাকলেও সরকারি নীতির জাঁতাকলে পড়ে তাদের অধিকার লঙ্ঘিত হয়। এই সময়ে উৎসাহ ভাতা পাবেন কিনা এই নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছিল। কেন্দ্র সরকার থেকে কোভিড আক্রান্ত আশাকর্মীদের জন্য এক লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করা হয়। অথচ আবেদন করেও এই পাঁচ জনের মধ্যে কেউই টাকা পায় নি। কোভিড আক্রান্ত হওয়ার দরুণ সামাজিক ট্যাবুর শিকার ও মানসিক যন্ত্রণাও বহন করতে হয়েছিল।

একটা অভিজ্ঞতা এখানে দেওয়া হলঃ - "একদমই... খুবই মেনটালি আমি যখন

জানতে পারি আমার এটা হয়েছে.... পৃথিবীতে মনে হয়েছিল আমি সমাজ থেকে একদম আলাদা হয়ে গেলাম, মেনটালি খুবই শকড হয়েছিলাম" । আমার বাড়ির লোকই গেছে ব্যাঙ্কে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে জানে যে এরকম হয়েছে, বলছে তুমি ওদের বাড়ির মেয়ে তাই না ? চলে যাও চলে যাও... বুঝতেই তো পারছেন তখন যতটা ছিল এখন মানুষ পালটে গেছে, এখন আমাদের সকলের শরীরে থাকতে পারে আমার যখন মানে ২৫/৬ এ হয়েছিল তখনএর তুলনায় এখন ঘরে ঘরে অতটা মানুষ ভয় পাচ্ছে না, তখন মানুষ ভয় পেত।

আশা দিদিদের দাবি

জনস্বাস্থ্য তথা মা ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় আশাকর্মীদের ভূমিকার নাতিদীর্ঘ আলোচনা আমরা আগের এক বিভাগে করেছি। অতিমারি রুখতে যে ভাবে ঝুঁকি নিয়ে দিনের পর দিন কমিউনিটির মধ্যে গিয়ে আশাকর্মীরা কাজ করেছেন এর সঠিক মূল্যায়ন এখনও হয়নি। এ নিয়ে বিস্তর আলোচনার প্রয়োজন আছে।

আশাকর্মীদের অবস্থার উন্নতির জন্য তাঁদের কী দাবী-দাওয়া? প্রথম যে বিষয় নিয়ে তাঁরা কথা বলেছেন তা হল তাঁদের কাজের স্বীকৃতি। সরকারি ভাবে আজও স্বেচ্ছাসেবক, অথচ কাজের দায়িত্ব অনেক। এমনকি তাঁদের ভাতা নূন্যতম মজুরির থেকেও কম। আশাকর্মীরা মনে করেন, মাসে কমপক্ষে ১৫ হাজার টাকা দেওয়া উচিত। সঙ্গে সামজিক সুরক্ষার কিছু বিধান থাকলে জীবনের মানোন্নয়ন হতে পারত। উৎসাহ ভাতার ক্ষেত্রেও নানা জটিলতার কারণে অনেক সময় প্রাপ্য ভাতা থেকে তাঁরা বঞ্চিত হন যেমন, হাসপাতালের পথে প্রসব হলে আশাকর্মীদের উৎসাহ ভাতা দেওয়া হয় না। অথবা পঞ্চাশ ঘরের নুন টেস্ট করতে পারলে ২৫ টাকা। আশা কর্মীদের ভাল কাজের পরেও তাঁদের উৎসাহ ভাতা কমে যাচ্ছে। জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ব্যাপক প্রচার ও সচেতনতার কারণে উন্নত কিছু এলাকায় আশাকর্মীদের আয় কমে যায়। নতুন নতুন বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেলে তাঁদের কাজের গুণগত মানের উন্নতি হতে পারে। মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য কিছু সুযোগ থাকা দরকার বলে আশাকর্মীরা মনে করেন।

শেষের কিছু জরুরি আলোচনা

জনস্বাস্থ্যে আশাকর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও, আমরা আগেই ইঙ্গিত করেছিলাম, জনপরিসরে ওদের নিয়ে আলোচনা অতি সামান্য। ইন্টারনেট সার্চ করেও অতিমারির আগে গুটি কয়েক সংবাদ বা প্রবন্ধ পাওয়া যায়। এছাড়া বিদেশের স্বাস্থ্যবিষয়ক জার্নাল "The Lancet"-এ, কিছু প্রবন্ধের সন্ধান পাওয়া যায়। এছাড়া বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে কয়েকটি রাজ্যে যেমন মধ্যপ্রদেশে আশাকর্মীরা বিক্ষোভ দেখালে সরকার খুব তৎপরতার সঙ্গে তা ভেস্তে দেয় এবং অনেককেই কাজ হারাতে হয়। ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নানা বিষয়ে মন্তব্য করে থাকেন, ২০১৮ সালে তিনি আশাকর্মীদের ভাতা বৃদ্ধি করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন। তবে এই আশ্বাস বাস্তবে রূপায়িত হয় নি। বরং বর্তমান সরকার স্বাস্থ্যসহ জনকল্যাণ কর্মসূচী গুলোর ব্যয়ভার ক্রমশ রাজ্য সরকারের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। এ ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে কেন্দ্র সরকার এদের প্রতি মাসের ভাতা বাবদ মাত্র ২০০০ টাকা বহন করে,

অতিরিক্ত খরচ রাজ্য সরকারকেই বহন করতে হয়। করোনা পরিস্থিতিতে আশাকর্মীদের কাজের অত্যাধিক চাপ বাড়তে থাকায় বেশ কয়েকটা রাজ্যে অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে, এবং দেশ জুড়ে বিক্ষোভের ফলে বিজেপি- র সাংসদ ভর্তহরি মাহতাব-এর নেতৃত্বে গঠিত শ্রম সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি (The Parliementary Standing committee) বলেছেন যে, আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের কাজকে স্বীকৃতি দেওয়া দরকার। তাঁদের মজুরি সুনির্দিষ্ট করা উচিত এবং তাঁদের ঠিকাকর্মী হিসাবে গণ্য করা উচিত নয়। আশা ও অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের কাজের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এই উদ্বেগ প্রকাশ করা হলেও আদতে কাজের কাজ কিছু হয়নি। বিরোধী দল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা রাহুল গান্ধী এই নিয়ে প্রথম টুইট করলেন " ASHA workers take health protection to homes across the country. They are truly health warriors, but today they are forced to go on strike for their own rights". এ প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি আরও যোগ করেন যে আশা কর্মীদের কাজের সুযোগ

সুবিধা বাড়াতে হবে এবং সরকার এ ব্যপারে 'নীরবতা' দেখিয়েছে। এ ব্যপারে এখন সম্ভবত " অন্ধ ও বধির"-এর মতো ভূমিকা পালন করছে বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে আশাকর্মীর করোনায় মৃত্যু হলে ১০ লক্ষ টাকা ও আক্রান্ত হলে ১লক্ষ টাকা এককালীন সাহায্য দেওয়া হবে। ওড়িশা সরকার মৃত্যু হলে ১০ লক্ষ টাকা এবং পরিবার পেনসন পাবে ঘোষণা করে।

যে আশাকর্মীদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম তাঁদের মধ্যে চার জন করোনায় আক্রান্ত হলেও এঁদের মধ্যে কেউই সরকারি সাহয্য পাননি। চার জন ইতিমধ্যে কাগজপত্র জমা করেছেন, সাহায্যের আশায় দিন গুনছেন ।

আশাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলেই জানা যায় কীভাবে অনুকূল পরিস্থিতিতে কমিউনিটির মধ্যে কাজ ছাড়াও স্থানীয় আইসোলেশনে সেন্টারে পরিযায়ী শ্রমিকদের নিভৃতবাসের দিনগুলোতে, ব্যক্তিগত ও পরিবারিক ঝুঁকি সত্বেও তাঁদের দেখা ভালের দায়িত্ব সামলেছেন। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সাধারণ সময়ে এবং করোনাকালে এতো গুরুত্বপূর্ন

ভূমিকা পালন করছেন, অথচ মেয়েদের এই বিপুল শ্রমশক্তির অবহেলা কেন ? তাঁদের দাবি দাওয়া ও প্রতিবাদ সংগঠিত হতে কেন দেওয়া হয় না? কেন প্রতিবাদ করলেই এসএমস-এর মাধ্যমে চাকরি থেকে বরখাস্তের নোটিশ চলে আসে ? সরকারি খাতায় আশাকর্মীরা স্বেচ্ছাসেবক। অথচ ভারত কেন, বিশ্বে কোথাও স্বেচ্ছাসেবকের এই দীর্ঘ কাজের বা দায়িত্বের তালিকা আছে? যদিও বলা হচ্ছে, আংশিক সময়ের কাজ, কিন্তু কাজের ধরন অনুসারে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা ব্যস্ত থাকতে হয়। অথচ ভারত ও অঙ্গরাজ্যগুলির শ্রম আইন আইনে কেন প্রযোজ্য নয়? এমনি কি অনেক ক্ষেত্রে আশাকর্মীদের নূন্যতম মজুরি আইন-এর বাইরে রাখা হয়। এঁদের দাবিদাওয়া নিয়ে প্রতিবাদ করতে রাজনৈতিক দলগূলির এত অনীহা কেন ? এই গবেষণায় আশাকর্মীদের সঙ্গে কথায় এই ধরনের প্রশ্নগুলো ঘুরে ফিরে এসেছে। আশাকর্মীদের গুরুত্বপূর্ন কাজের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে 'কাজের নারীকরণ' । 'কেয়ার ওয়ার্ক' যেন মেয়েদের জন্মজাত কাজ যেখানে শ্রমের কোনও বাজার মূল্য থাকে না। নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রশ্নই তুলেছেন, তাঁর " পরিবার,

কাজ ও মেয়েরা' বইয়ে। "আমরা দেখছি যে মেয়েদের কোন প্রতিবাদ বা দাবিদাওয়া ছাড়াই যে কোনা অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে টিকে থাকার জন্য জরুরি শিক্ষা ছোট থেকে দেওয়া হয়"। সেই অনুযায়ী একদিকে পরিবার অন্যদিকে রাষ্ট্রও মেয়েদের কাজকে বিনা পারিশ্রমিকে বা বিনা স্বীকৃতিতে ব্যবহার করে নেয়। করোনার সময় সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার গুরুত্বের দিক ফুটে উঠল, এবং দেখা গেল রোগ প্রতিরোধমূলক কাজটা কম পয়সায় করে ফেলা সম্ভব হল মেয়েদের জন্যই - মেয়েরাই কেবল পরিবার , সমাজ ও রাষ্ট্র-এর জন্য স্বেচ্ছাশ্রম ও পরার্থপরতার উদাহরণ হয়ে থাকবে।

Late Krishna Bhattacharya

Distinguished Teacher of Education,
West Bengal Education Service

Jinat Rehena Islam, Educationist
Murshidabad, West Bengal

Ashina Gramin Library, Falta
South 24 Parganas, West Bengal

Shantilata Todu, Social Activist
Working for Women, Murshidabad

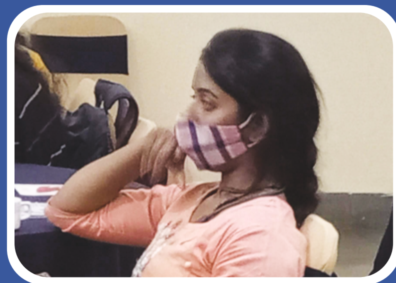

Tania Das
Bhoruka Public Welfare Trust

Krishna Trust

HB-232, First Floor, Sector-III, Salt Lake
Kolkata-700 106, Phone +91-33-23371801